নিঝুমপুর

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬০

❑ প্রকাশক ❑
সমীরকুমার নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ❑
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

(এক) নিঝুমপুর কোথায়, কে জানে?

'তবু যেতে হবে, শালবন,
হয়তো ফুটেছে ফুল,
শালফুল কখনো দেখিনি,
শালফুল হয়তো ফোটে না,
ফুটলেও যাবে না চেনা, কেন না এপথ
... .চলেছে নিঝুমপুর।'

এই পথ দিয়ে নিঝুমপুর যাওয়া যায়। আবার এই পথ দিয়ে নিঝুমপুর থেকে ফিরে আসাও যায়।

তবে রাতের বেলা নিঝুমপুরে যাওয়ার অসুবিধে আছে। সূর্যাস্তের পরে বাস চলে না।

যুদ্ধের বাজার। ব্ল্যাক আউটের নিষেধ রয়েছে। সন্ধের পরে বাসের হেডলাইটের আলো তো দূরের কথা গাড়ির ভিতরের আলো জ্বালাও নিষেধ। জেলা সদর থেকে গোরা মিলিটারিরা অন্ধকার নিঃশব্দ জিপে আগাগোড়া রাস্তা টহল দিয়ে বেড়ায়। ধরা পড়লে বিপদ।

সকাল থেকে, সকাল মানে প্রায় ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে সূর্যাস্তের দেড়ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আটটা বাস যায় আর আটটা বাস আসে।

প্রথম বাসটা ছাড়ে কাক ডাকা ভোরে। যাত্রীরা অনেকে এসে বাস

স্ট্যান্ডের ন্যাড়া ঠাকুরের থানে রাত কাটায়। সকালের প্রথম বাস যাতে ধরতে পারে সেই জন্যে।

প্রথম বাসটা সরাসরি জেলাসদরে যায়। আগে সব বাসই জেলাসদরে যেতো সরাসরি, কিন্তু এখন অর্ধেক বাস নিঝুমপুর হয়ে যায়। যে বাসগুলো নিঝুমপুর ঘুরে জেলাসদরে যায় সেগুলোর যেতে সরাসরি বাসগুলোর তুলনায় দেড়ঘণ্টা বেশি লাগে।

নিঝুমপুরের পথটা ঘোরা পথ। তা ছাড়া বেশ কয়েক মাইল রাস্তা নদীর ধার ঘেঁষে, সেখানে সাবধানে, আস্তে বাস চালাতে হয়। তবু বাসগুলো ঘোরা নিঝুমপুর করতে হয়েছে। নিতান্ত বাণিজ্যিক কারণে। চারদিকে চর পড়ে পড়ে এমন হয়ে গেছে যে স্টিমার শুধু এখন নিঝুমপুরের ঘাটেই ভেড়ানো যায়।

আর এস এন মানে রয়াল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির স্টিমার আগে দিনে তিনবার মহারাজগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতো। যুদ্ধের বাজারে সে বিলাসিতা বন্ধ হয়েছে। এখন মাত্র দুবার তাও যমুনা নদীর এপারের পুরনো বিখ্যাত স্টেশনগুলিতে পৌঁছায় না, এখন নতুন স্টেশন নিঝুমপুর। নিঝুমপুরেই নদীর জল একটু গভীর। স্টিমার ঘাট পর্যন্ত না হলেও ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। স্টিমার আর ঘাটের মধ্যে একটা গাধাবোট লাগানো আছে। যাত্রীরা সেই গাধাবোটের ওপর দিয়ে হেঁটে নদীর পাড়ে এসে ওঠে।

এই যাত্রীরা কেউ অবশ্য নিঝুমপুরে আসেনি। নিঝুমপুর ছোট জায়গা। গঞ্জ নেই, অফিস-কাছারি নেই। ঘাটের ধার থেকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত একটা বাজার বসে প্রতিদিনই। ঘাটের ধারে আর বাস স্ট্যান্ডে গোটা কয়েক মিষ্টির দোকান আছে। নিঝুমপুরের ক্ষীরের মিষ্টির এ অঞ্চলে সুনাম। মিষ্টি কম দেয়া লালচে রঙের ক্ষীরের বরফি। বিলিতি চকোলেটের চেয়ে সুস্বাদু। খুব মজার নাম মিষ্টিটার, রাঘবসই।

নিঝুমপুর দিয়ে যারা যাতায়াত করে তারা, হাতে পয়সা থাকলে, বাড়ির জন্যে কিংবা কুটুম বাড়ির জন্যে হাঁড়িভর্তি রাঘবসই কিনে নেয়।

নিঝুমপুরের মত ছোট জায়গায় সাধারণত দৈনিক বাজার বসে না

কিন্তু নিঝুমপুরে বসে। কারণ ভায়া নিঝুমপুর বাস আর স্টিমার। বাস রাস্তা দিয়ে শুধু বাসই চলে তা নয়। পথচারী যায়, সাইকেল যায়, গরুর গাড়ি যায়, ঘোড়ার গাড়ি যায় কখনো নতুন বৌ নিয়ে, কাপড়চাপা ডুলি যায়, ছেলেপুলে নিয়ে হুমহুম পালকিতে করে লাল শাঁখা, নাকে সোনার নোলক গিন্নিবান্নি মানুষ বাপের বাড়িতে যায়।

বাস স্ট্যান্ডের ধারে পরপর কয়েকটা চালাঘর। তার একটায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পরেশ দত্ত বসে। পাশে দুটো মুদিখানা দোকান। একেবারে শেষের ঘরটা সাব পোস্টাফিস, ডাকঘর। সাইনবোর্ডে লেখা আছে মকদমপুর ডাকঘর, জেলা ময়মনসিংহ।

ভেতরের দিকে এক ক্রোশ এগিয়ে গেলে মকদমপুর গ্রাম। বর্ধিষ্ণু মুসলমান চাষীদের পল্লী, কয়েক ঘর ঘোষ পরিবার আছে, হিন্দু গোয়ালা। আর একটা কুমোরপাড়া।

ডাকঘরটা মকদমপুরের নামে হলেও আছে এই নিঝুমপুরে। এখানে বাস স্ট্যান্ড রয়েছে, স্টিমার ঘাট রয়েছে। দশ জায়গার লোকজন নিঝুমপুর দিয়ে যাতায়াত করে। এখানেই ডাকঘরটা মানিয়েছে।

মকদমপুর নামটা যে রয়েছে এতেই ওখানকার লোকের খুশি। চিঠিপত্র আদান-প্রদানে তাদের খুব বেশি উৎসাহ নেই। বছর কয়েক আগে মকদমপুরের হাজি বাড়ির জামাই, পাবনায় দেশ, সে জেলা সদরে গেজেটেড পোস্টমাস্টার হয়ে এসেছে। সেই তদ্বির করে মকদমপুর সাব পোস্টাফিসটি বসিয়েছে।

মকদমপুর পোস্টাফিসের মাস্টারবাবু হলেন তিনকড়ি সান্যাল। তিনি পুরো সরকারি চাকুরে নন। কনট্র্যাক্ট ওয়ার্কার বলা যেতে পারে।

তবে তিনকড়িবাবুর এটাই একমাত্র চাকরি নয়। তিনি ভায়া নিঝুমপুর বাসের টাইমকিপার। বাস যখন নিঝুমপুর দিয়ে যাওয়া শুরু করে, সেই যখন নিঝুমপুর ঘাটে স্টিমার আসা আরম্ভ করে তখন

টাইমকিপারের চাকরির অনেক অনেক দাবিদার ছিলো। তার মধ্যে প্রধান হলো ডাঃ পরেশ দত্ত। ওপাশের ঐ হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির ডাক্তার।

এর অল্পদিন আগেই মকদমপুর ডাকঘর স্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বহিরাগত তিনকড়ি সান্যাল মুরুব্বির জোরে ডাকমাস্টার হয়ে এসেছেন।

এই পোস্টাফিসের কাজ খুব সোজা। সেভিংস ব্যাঙ্ক নেই। মানি অর্ডার নেই। শুধু খাম পোস্টকার্ড বেচা। ডাকবাক্সে চিঠি পড়লে সেগুলিকে ছাপ মেরে দুটো মেলব্যাগে ভরে গালা দিয়ে সিল করা। একটা মেলব্যাগ স্টিমারে ওঠে, আরেকটা মেলব্যাগ সকালের প্রথম বাসে।

স্টিমারে আর বাসে চিঠিও আসে। সেগুলিকে ছাপ্পা দিয়ে তিনকড়ি মাস্টার তাঁর কাঠের তক্তাপোষের ওপরে ভাগে ভাগে গ্রাম অনুযায়ী সাজিয়ে রাখেন। সংশ্লিষ্ট গ্রামের লোক দেখলে সেই এলাকার চিঠি তার হাতে দিয়ে দেন। অনেক সময় উৎসাহী গাঁয়ের লোকেরা নিজেরাই খোঁজ করে তাদের গাঁয়ের চিঠি নিজেরা যেচে নিয়ে যায়।

কাছারি টাউনে ডাক্তার পরেশ দত্তের যেরকম যোগাযোগ আছে তাতে ভায়া নিঝুমপুর বাসের টাইম কিপারের চাকরিটা তাঁর হয়ে যেতো।

টাউন কাছারির এক নম্বর মোক্তার দুর্লভ দাসের মুহুরি হলেন ডাক্তারবাবুর বেয়াই। সপ্তাহে একদিন তিনি টাউনে যান হোমিওপ্যাথিক ওষুধপত্র, শিশি, কর্ক এই সব কিনে আনতে।

কিন্তু অসুবিধে হলো ডাক্তার পরেশ দত্তের কোনো ঘড়ি নেই। একটা পুরনো দেয়াল ঘড়ি আছে উলপুর মাইনর ইস্কুলে কিন্তু সেও এখান থেকে আধ মাইল।

তিনকড়ি সান্যালের কিন্তু ঘড়ি আছে। সাবেকি রুপোর চেনে বাঁধা গোল পকেট ওয়াচ। পৈতেয় উপহার পাওয়া টাকা দিয়ে ঢাকায় রহমানিয়া অ্যান্ড কোম্পানি থেকে পনেরো বছর আগে কিনেছিলেন।

সেই ঘড়ির জোরেই টাইম কিপিংয়ের কাজটা পেয়ে যান তিনকড়ি সান্যাল।

কাজটায় কোনো পরিশ্রম নেই। বসে বসে মাসে ফোকটে বারো টাকা

উপার্জন। বাস থামতেই ড্রাইভাররা একটা ময়লা ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে আসে। পকেট ঘড়ি ভালো করে দেখে বাসের আসার সময় এবং দশ মিনিট বাদে বাস ছেড়ে যাওয়ার সময় লিখে দিতে হয়।

ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাসের মালিকদের কাছে। দু-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হলে এর মধ্যে স্টিমার হাতছাড়া হয়ে যায়। স্টিমারের প্যাসেঞ্জারেরা আগের কিংবা পরের বাসে কিংবা অন্য কোনো বাহনে চড়ে বেরিয়ে যায়। যে কারণে বেশি তেল পুড়িয়ে, বেশি সময় খরচ করে এই পথে যাওয়া সেই কারণটাই নিষ্ফলা হয়ে যায়, ব্যবসায় ক্ষতি হয়।

ডাক্তার পরেশ দত্ত বাসের সময় রক্ষকের কাজটা ন্যায্য কারণেই পাননি এবং সে জন্যেই ভিনদেশি তিনকড়ি সান্যালের ওপর তাঁর কোনো রাগ নেই।

তা ছাড়াও তাঁর চালচুলোহীন ভাঙা চালা ঘর দেখে বোঝা না গেলেও তাঁর বিশাল প্র্যাকটিশ এই অঞ্চলে।

তিনি শুধু হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন এমন নয়। অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমি, টোটকা এমনকি ঝাড়ফুঁক, যা যতটুকু জানেন, রোগীর ওপর প্রয়োগের চেষ্টা করেন।

স্টিমার ঘাটের পাশেই নৌকোর ঘাট। সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে নৌকোয় করে রোগী আসে। সেখানে গর্ভপাতের মত গোপন কাজের জন্যে ভিন গাঁয়ের বিধবা যেমন আছে, তেমনই আছে সাপে কাটা রোগি।

পরেশ ডাক্তার কি চিকিৎসা করছেন তা নিয়ে রোগি বা তাদের আত্মীয়স্বজন তেমন মাথা ঘামায় না। নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী পরেশ ডাক্তার চিকিৎসা করেন।

কাছারির বাজার থেকে অ্যাসপিরিন কিনে আনেন। তারপর বাসায় গিয়ে সেটা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করেন। ছোট ছোট সাদা কাগজের পুরিয়া বানিয়ে হোমিওপ্যাথিক গুঁড়ো ওষুধের মত রোগীদের দেন। মাথা ধরা, গা ব্যথা, সাধারণ সর্দিজ্বর এতে উপশম হয়ে যায়। তেমনিই দুর্বল

রোগির স্বাস্থ্য ফেরাতে ব্রান্ডির মধ্যে জল মিশিয়ে শিশিতে দাগ কেটে ওষুধ বানিয়ে দেন।

ডাক্তার পরেশ দত্ত এই গ্রামেরই পুরনো লোক। কয়েক পুরুষের বাস এই গ্রামে। নদীর ধার থেকে একটু এগিয়ে বাঁশবনের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, সেই কাঁচা রাস্তা, বর্ষাকালে যেটা খাল হয়ে যায় সেটা গিয়ে নেমেছে দত্তপাড়ায়। বেশ কয়েক ঘর দত্ত আর গুহ এ পাড়ায় বসবাস করে।

আগে শুধু দত্তরাই ছিলো। গুহরা দৌহিত্র বংশ, এক ঘর জামাইয়ের সুবাদে তিন ঘর গুহবংশীয় দত্তপাড়ায় রয়েছে।

গুহদের সঙ্গে পুরনো দত্তদের সম্পর্ক মোটেই সুবিধের নয়। যদিও তিন পুরুষের বেশি বসবাস হয়ে গেলো গুহদের তবু তাদের এখনো আগন্তুক বলেই মনে করে দত্তরা।

এই গুহদেরই একটি বাড়িতে পাঁচটাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করে থাকেন তিনকড়ি সান্যাল, তিনি ব্রাহ্মণ মানুষ, স্বপাকে রান্না করে খান। তবে তাঁর সারাদিনই কেটে যায় ডাকঘরে। সকাল বেলায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে লেবুর রস আর চিনি দিয়ে দু মুঠো চিঁড়ে ভেজা খেয়ে তিনকড়ি ডাকঘরে চলে যান, সেখানে গিয়ে সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখেন।

এদিকে জেলা সদরগামী প্রথম বাস আসে সকাল ছয়টার মধ্যে। এই বাসটায় অবশ্য স্টিমারের যাত্রী থাকে না। দুচারজন গহনাব নৌকোর যাত্রী কখনো কখনো থাকে। এই প্রথম বাসের অধিকাংশ যাত্রীই জেলা সদরে যায় মামলা-মোকদ্দমা, অফিস-কাছারির তদ্বির তদারকে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যায় পাইকারি কেনাকাটা করতে জেলা সদরের প্রাচীন বাজারে।

প্রথম বাসটা ছেড়ে যাওয়ার পর তিনকড়ি ডাকঘরে ঢোকেন। প্রথম বাসটা, একটা মেল আসে, তাতে খুব বেশি চিঠিপত্র থাকে না। তবে মহারাজগঞ্জের কিছু চিঠি থাকে সেগুলো স্টিমারে তুলে দিতে হয়। স্টিমার কোম্পানির সঙ্গে ডাকবিভাগের চুক্তি আছে, তারা ঐ ডাক মহারাজগঞ্জের হরকরার হাতে দিয়ে দেয়।

মহারাজগঞ্জের হরকরা সনাতন পাল মহারাজগঞ্জ ঘাটে অপেক্ষা

করে। আবার কোনো দিন স্টিমারে উঠে নিঝুমপুর পর্যন্ত চলে আসে। তার তো স্টিমার ভাড়া লাগে না। এখান থেকে ডাকের খলে নিয়ে যায়।

সনাতন পাল এলে এক বেলা থেকে যায়। নিঝুমপুর স্টিমার ঘাটের অদূরে, এই অঞ্চলের শ্মশান, সেই শ্মশানের টিনের চালার নিচে এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত গাঁজার আড্ডা।

সনাতনের গাঁজার দোষ আছে। নিঝুমপুরে এলে [illegible] সে কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে যায়।

বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রথম স্টিমার এসে নিঝুমপুরের ঘাটে ভেড়ে। এই স্টিমারের টাইম অবশ্য তিনকড়ি সান্যালকে রাখতে হয় না। তবে এই স্টিমারে সময়ের ওপরে নির্ভর করে এই লাইনের বাসগুলো চলে।

সকাল বেলার এই স্টিমারের ওপরে ডাক্তার পরেশ দত্তও নির্ভরশীল। তাঁর অনেক রোগীই আসে এই স্টিমারে। নৌকোয় গয়নার নৌকোয় যত রোগী আসে তার প্রায় সমান সমান আসে দৈনিক সকাল বেলার স্টিমারে।

পরেশ ডাক্তারের হাতযশ এতই ছড়িয়েছে যে মহারাজগঞ্জের সকাল বেলার স্টিমারে কোনো অসুস্থ লোক দেখলেই, এই প্রশ্ন অবধারিত, 'নিঝুমপুরে পরেশ ডাক্তারকে দেখাতে যাচ্ছেন বুঝি!'

দুপুরে পরেশ ডাক্তার বাড়িতে খেতে যান। সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রামও করে আসেন। এর পরে চালাঘরে ফিরে এসে রোগী দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। নৌকোয় লণ্ঠন জ্বালিয়ে শেষ রোগীকে নিয়ে নৌকো চলে যায় নদীর এপার ওপারে।

তিনকড়ি সান্যাল কিন্তু দুপুরে খেতে যান না। তাঁর দুপুরে খাওয়ার কোনো বন্দোবস্তই নেই। তিনি মিষ্টির দোকান থেকে দু পয়সা দামের দুটো রাঘবসই আর মুদি দোকান থেকে অল্প মুড়ি কিনে খেয়ে নেন।

পুরো অব্রাহ্মণ অঞ্চল। তিনকড়ি সান্যাল সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে নিজে রান্না করে খান। ঘরে ফেরার সময় নদীর ঘাটের বাজার থেকে দৈনিকই কিছু টাটকা সবজি কিনে নিয়ে যান। সপ্তাহে একদিন মকদমপুরে ঘোষেদের বাড়ি থেকে আধ পোয়া ঘি কিনে আনেন।

বেগুন-পটল বা কুমড়ো সেদ্ধ লঙ্কা-নুন তেল দিয়ে মাখা সেই সঙ্গে ঘি দিয়ে গরম লাল চালের, ভাত। সন্ধ্যায় ভরপেট খেয়ে নেন তিনকড়ি সান্যাল। এই অভ্যেসটা তাঁর বহুদিনের। বিকেলের শেষ রোগী চলে যাওয়ার পর পরেশ ডাক্তার তিনকড়ি মাস্টারের ডাকঘরে আসেন। ডাকঘরের পোস্টমাস্টার বলে পরেশবাবু তিনকড়িকে তিনকড়ি মাস্টার বলেন।

শেষ বাস অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। পোস্টাফিসের কাজকর্ম গুছিয়ে তুলে তিনকড়ি মাস্টারও বাড়ি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন।

তিনকড়ির বয়েস পরেশ ডাক্তারের চেয়ে অন্তত বিশ বছর কম। তিনকড়ি তিরিশ বছরের যুবক আর পরেশ ডাক্তার হলেন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়।

পরেশ দত্ত বিকেলে কাজের শেষে যখন ডাকঘরে ঢোকেন, তিনকড়ি হুঁকো সেজে এগিয়ে দেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি খুব সাবধান, নিজের হুঁকোটা দেন না। এই জন্যে তাঁর ঘরে একটা অতিরিক্ত হুঁকো রয়েছে।

পরেশ ডাক্তার প্রতিদিনের মত আজকেও তাঁর রোগীদের কথা বলেন। আজ এক সাপে কাটা রোগী এসেছিলো। একদম ঝিমিয়ে গেছে, বাঁচবে না। তিনি অনেক ঝাড়ফুঁক করেছেন। কিন্তু এ তাঁর কর্ম নয়। মতলবপুরের কালু ফকির হলে হয়তো বাঁচাতে পারতো।

এই সময় হঠাৎ দরজার কাছে সনাতন হরকরা উদয় হলো, হাতে মেলব্যাগ। তাকে দেখে বিরক্ত হলেন তিনকড়ি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি তুমি বিকেলের স্টিমারে ফিরে যাওনি?'

গাঁজা খেতে গিয়ে স্টিমার ফেল করেছে। সনাতন কী আর বলবে।

কী আর করবেন, তিনকড়ি বললেন, 'রাতে ডাকঘরে থেকে যাও। মেলব্যাগটা হাতছাড়া করবে না। মাথায় দিয়ে শোবে। আর দ্যাখো, সেবারের মত সরকারি ঘরে গাঁজার আড্ডা বসিয়ো না।'

সনাতনের হাতে ডাকঘরের চাবি দিয়ে পরেশ ডাক্তারের সঙ্গে তিনকড়ি ঘরের দিকে রওনা হলেন।

তিনকড়ির একটা ছোট দু-ব্যাটারি টর্চ আছে। যুদ্ধের বাজার ব্যাটারির

খুব দাম। সেই জন্যে তিনকড়ি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করেন না। তবে পরেশবাবুর হাতে লণ্ঠন থাকে। দুজনে প্রায় একই রাস্তায় বাড়ি ফেরেন।

বাঁশবনের ভিতরে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার রাস্তা। জোনাকিগুলো আস্তে আস্তে জ্বলে ওঠে। দূরে নদীর ধারে সারি দিয়ে বসে শেয়ালেরা ডাকে। দত্তপাড়া থেকে কুকুরগুলো ছুটে আসে।

ততক্ষণে পরেশ দত্ত তাঁর বাড়িতে এসে গেছেন। আর কয়েকটা বাড়ি পেরোলেই, পাড়ার ও পাশে অক্ষয় গুহের বাড়ি। তারই বাইরের ঘরে তিনকড়ির আস্তানা।

বাড়ির অন্দর থেকে বাইরের ঘরের মধ্যে একটা পাটকাঠির বেড়া আছে। তিনকড়ি সান্যালের পায়ের শব্দ শুনে অক্ষয় গুহের ছোট ভাইয়ের বউ তুলসীতলার প্রদীপটা তুলে পাটকাঠির বেড়ার দরজার কাছে দাঁড়ায়। একটু আলো আসে বাইরের উঠোনে।

চৈত্রমাস। বাইরের ঘরের পাশে একটা বকুল ফুলের গাছ থেকে টুপটুপ করে ফুল ঝরে পড়ে। দূরে কোথায় একটা পাখি ডেকে ওঠে, 'যাই যাই।'

আরো দূরে আরেকটা পাখি ডাকে, 'যাও যাও।'

নিঝুমপুরে সন্ধ্যা নামে।

(দুই) বহুদিন চিঠি নেই পত্র নেই

'পথে নিম গাছ,
নিচের পুকুরে
সবুজ জলের নিচে সাদা পুঁটি মাছ।
ঘুরে ঘুরে
জলে ঝরে পড়ে সাদা ফুল।.....
.....বহুদিন চিঠি নেই, পত্র নেই
প্রাণের অতুল।'

গতকাল রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। উঠোনে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কাকের বাসা ভেঙে গেছে। দলে দলে কাক এসে মহা হইচই বাধিয়েছে।

তিনকড়ি সান্যাল খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন। সকাল পাঁচটা সোয়া পাঁচটায় সূর্যোদয় হয়ে যায়। এখন আবার যুদ্ধের বাজারে দুতিনরকম সময় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম, বেঙ্গল টাইম, লোক্যাল টাইম।

রেডিয়োতে অবশ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমই ব্যবহার হয়। নিঝুমপুরে একটাই রেডিয়ো। দত্তদের ছোট তরফের বাড়িতে। সে বাড়িটা তিনকড়ির বর্তমান আস্তানা এই গুহবাড়ির ঠিক পিছনে। কিন্তু যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়।

তা ছাড়া অন্য একটা বাধা আছে। দত্তবাড়ির ছোট তরফের লোকজনেরা একটু উদ্ধত। যুদ্ধের বাজারে পাটের দালালি করে হাতে কাঁচা পয়সা হয়েছে। সেই সঙ্গে মিলিটারি কনট্র্যাক্টরের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। টাটকা শাকসব্জি, ডাল, মাছ-মাংস যখন সৈন্যদের যা চাহিদা

সেটা আশেপাশের দশবিশটা গ্রাম ঝেঁটিয়ে চালান দেয। নির্দিষ্ট দিনে মিলিটারি ট্রাক এসে নিয়ে যায়।

দত্তেরা উচ্চবর্ণের হিন্দু কায়স্থ। কিন্তু তারা লাভের আশায় সৈন্যদের খাওয়ার জন্যে গরু চালান দেয়। স্থানীয় হিন্দুরা এটা ভাল চোখে দেখে না।

এর চেয়েও সাংঘাতিক কথা দত্তেরা নাকি মিলিটারিদের প্রয়োজন মত মেয়ে সরবরাহ করে। সন্ধ্যার অনেক পরে নৌকো করে নদীর ঘাটে দূরদূর চর অঞ্চল আর পাড়াগ্রাম থেকে গরিব ঘরের মেয়ে বৌদের নিয়ে আসে। তারপর অনেক রাতে সবুজ রঙের ট্রাকে গরু-ছাগলের মতই তাদের তুলে দেওয়া হয়। পুবো ব্যাপারটাই হয় গোপনে গোপনে। তবু এলাকার লোকের চোখ এড়ায় না।

তিনকড়ি সান্যাল সামান্য সাব-পোস্ট মাস্টার বা বাসের টাইম কিপার হলেও তিনি সুশিক্ষিত পণ্ডিত বংশের সন্তান। তাঁর পিতামহের সংস্কৃত টোলে দূর দূর থেকে ছাত্রেরা পড়তে আসতো। তাঁদের একটা বংশ গৌরব আছে।

নাবালক বয়েসে তিনকড়ি পিতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁর বাবা ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট স্কুলে সেকেন্ড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। একদিন স্কুলে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো, ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা ছাড়া তখন রাস্তায় এত গাড়ি-ঘোড়া ছিল না। পথ দুর্ঘটনা কমই ঘটতো। দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতমশায় স্কুলের সামনেই একটা মোটরগাড়িতে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন এবং সেই দিনই ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে মারা যান।

মোটরগাড়িটা বাস নাকি ট্রাক নাকি কোনো প্রাইভেট গাড়ি ছিলো এতদিন পরে সেটা তিনকড়িবাবুর খেয়াল নেই। কিন্তু ঘটনাটায়

ময়মনসিংহ সদরে হইচই পড়ে গিয়েছিলো। ময়মনসিংহ শহরে এবং সম্ভবত জেলাতেও মোটরগাড়ি চাপা পড়ে সেটাই প্রথম মৃত্যু। মৃত্যুর পরে পণ্ডিত- মশাইকে হাসপাতালে সাহেব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন।

সে কালে তো মাস্টারি চাকরিতে পেনশন, ডেথ পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি এসব কিছুই ছিলো না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে সাড়ে তিনশো টাকা ছিলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর রিলিফ ফান্ড থেকে একশো টাকা দিয়েছিলেন। সিটি কলেজজিয়েট স্কুলের ছাত্রেরা দুআনা-চার আনা চাঁদা দিয়ে আর শিক্ষকেরা প্রত্যেকে এক টাকা করে দিয়ে দেড়শো টাকার মত তুলে দিয়েছিলেন।

মোটমাট এই ছয়শো টাকার মত তিনকড়ির বিধবা জননীর হাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। সেকালের ছয়শো টাকা ছয় বিঘে জমির দাম। এই নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যথেষ্ট হিংসের ভাব দেখা দিয়েছিলো। কেউ কেউ এমনও বলেছিলো, বেঁচে থাকার চেয়ে পণ্ডিতের মরে গিয়েই দেখছি বেশি লাভ হলো।

খুব কষ্টে-সৃষ্টে তিনকড়ি সান্যালের বাল্য এবং কৈশোর জীবন কেটেছে। বাড়ির অবস্থা যে খুব খারাপ ছিলো তা নয়। প্রপিতামহের সূত্রে এবং বাড়িতে টোল থাকার কারণে কয়েক বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি ছিলো গ্রামে।

গ্রামের নাম সখিপুর। জেলা সদর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশে সাপাইল থানা। থানার অদূরেই সখিপুর বিরাট গ্রাম। হেমনগরের জমিদারদের এলাকা।

হেমনগরের জমিদারেরা তিনকড়ির প্রপিতামহকে সাত বিঘে জমি ব্রহ্মোত্তর করে দান করেছিলেন। নিষ্কর জমি খাজনা লাগে না, তবে বিক্রিবাটায় অসুবিধে আছে।

এই ব্রহ্মোত্তর জমিটুকু ছাড়া ঐ সখিপুর গ্রামের প্রান্তেই অহল্যা নদীর তীরে পণ্ডিতবাড়ির মানে তিনকড়ির পূর্বপুরুষদের কয়েক বিঘে নিজস্ব জমি ছিলো। অহল্যা নদী কালক্রমে সে সব জমির অনেকটাই গ্রাস করেছে।

শুধু তাই নয়, তিনকড়ি সান্যালের পিতামহ পণ্ডিত জগৎহরি সান্যাল ঐ অহল্যা নদীতেই ডুবে মারা গিয়েছিলেন। আশ্বিন মাসে মহালয়ার আগের দিন জগৎ পণ্ডিত যাচ্ছিলেন হেমনগরের রাজবাড়িতে। সখিপুরের সান্যালেরা পুরুষানুক্রমে হেমনগরের কুলপুরোহিত। দুর্গাপুজো করাতে যাচ্ছিলেন। সেদিন সকাল ছিলো নির্মেঘ, সূর্যকরোজ্জ্বল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এই নদীবেষ্টিত মধ্যাঞ্চলে আশ্বিন কার্তিক মাসে হঠাৎ হঠাৎ প্রমত্ত ঝড় দেখা দেয়। আকারে-প্রকারে প্রায় কালবোশেখির মত। তবে সংখ্যা খুব কম। বিধ্বংসী এইরকম ঝড় কদাচিৎ হয়। এইরকম এক ঝড়ে সেই পিতৃপক্ষের শেষ সকাল বেলায় জগৎহরি অহল্যা নদীতে জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

জগৎহরি সান্যালের স্ত্রী অনুরাধা দেবী ছিলেন ভদ্রনগরের চক্রবর্তী বাড়ির মেয়ে। তাঁর বাপের বাড়ির পরিচয় দিতে হলো এই কারণে যে ডাকসাইটে কলহপ্রবণ বলে ভদ্রনগরের চক্রবর্তী বাড়ির কুখ্যাতি ছিলো। এবাড়ির লোকেরা নাকি বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করতে পারতো। আশেপাশে অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় এবাড়িকে কেল্লাবাড়ি বলা হতো।

এই বাড়িরই মেয়ে অনুরাধা দেবী স্বামীর দুর্ঘটনায় নৌকো ডুবে মৃত্যুতে অহল্যা নদীকে শত্রু বলে সাব্যস্ত করলেন। সারা জীবন তিনি অহল্যা নদীকে সতীন বলে গালাগাল করতেন, সে তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে। যে হেতু জগৎহরির মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, অনুরাধা আমৃত্যু সধবার বেশে থেকেছেন, শাঁখা-সিঁদুর রঙিন কাপড় পরেছেন, আমিষ খেয়েছেন। এ নিয়ে তাঁকে কেউ কিছু বলার সাহস পায়নি।

সময় ও সুযোগ পেলেই নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে মুখ কবে চুটিয়ে অহল্যাকে গালাগাল করতেন অনুরাধা।

তিনকড়ির মনে আছে তাঁর বাল্যকালে পরপর দুবছর বন্যা হয়, যেটা বেশ স্বাভাবিক তাঁদের অঞ্চলে। সেই বন্যার সময় অহল্যা নদীর তীরে তাঁদের পারিবাবিক চাষের জমির অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিলো।

সকালের দিকে হয়তো খবর এলো যে আগের দিন রাতে নদীর ধাক্কায় জমির অধিকাংশ ভেঙে জলে পড়ে গেছে, পিতামহী এখবর

পাওয়ামাত্র রণরঙ্গিনী রূপ ধারণ করলেন, উঠোন জুড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সতীন অহল্যা নদীকে চূড়ান্ত গালাগাল দিতেন তাঁর সর্বনাশ করার চেষ্টা করার জন্যে।

তিনকড়িদের সংসার সে আমলের তুলনায় বড় ছিল না। ঠাকুমা, বিধবা মা, বিধবা পিসি, এক বড় পিসতুত ভাই, নিজের বোন তিনজন, দুজন তিনকড়ির বড়। আরেকজন ছোট।

একবার মকর সংক্রান্তির দিনে অহল্যা নদীতে ডুব দিতে গিয়ে তিনকড়ির বড়দি পদ্মাবতী অহল্যা নদীতে গলার সোনার হার হারিয়ে ফেলেছিলেন। জলের মধ্যে কোথাও পড়ে গিয়েছিলো. অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া যায়নি।

সেই মাঘমাসের দুপুরে নাতনির গলার সোনার হার অহল্যায় হারিয়ে যাওয়ায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন অনুরাধা দেবী। বিশাল চেলা কাঠ নিয়ে দূরবর্তিনী সপত্নী অহল্যা নদীর উদ্দেশে দৌড়ে গেলেন, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেননি। বাড়ির চৌহদ্দি পেরনোর আগেই মুখ থুবড়িয়ে পড়ে যান। সেখানে সেই মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনকড়ি তাঁর বাবাব সঙ্গে ময়মনসিংহ শহরে থাকতেন। হেমনগরের জমিদারদের কাছারি ছিলো ময়মনসিংহে, পুরনো যজমান হিসেবে সেই কাছারি বাড়ির নায়েবখানার একপাশে বহুদিনের পুরনো ছেঁড়া সতরঞ্জি দিয়ে ঢাকা একটা তক্তাপোষে পিতাপুত্রের স্থান হয়েছিলো। পণ্ডিতমশায় বারান্দার একপাশে তোলা উনুনে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিতেন। গ্রাম থেকে নিয়ে আসা খাঁটি গরুর দুধের ঘি দিয়ে মেখে ডালসেদ্ধ আর বেগুনপোড়া সহযোগে চমৎকার খাওয়া হয়ে যেতো। অনেকদিনই বিকেলে ভাত হতো না। বাজার থেকে আধ সের দুধ নিয়ে এসে উনুনে ফুটিয়ে তার সঙ্গে সবরি কলা ও চিড়ে দিয়ে মেখে রাত্রের আহার হয়ে যেতো।

বাবার মৃত্যুর দিন তিনকড়ির জ্বর হয়েছিলো। তখন খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। তিনকড়ি মাঝেমধ্যেই জ্বরে পড়তেন। সেদিন তিনকড়ি দুপুরে এক বাটি বার্লি খেয়ে জ্বরের ঘোরে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন।

এমন সময় ঘোরের মধ্যেই তিনকড়ি শুনতে পেলেন কারা যেন বাইরে তাঁকে ডাকছে।

তিনকড়ি বেরিয়ে দেখলেন, তাঁরই স্কুলের কয়েকজন ছাত্র। অধিকাংশই তাঁর ক্লাসের। উঁচুক্লাসের ছাত্রেরাও অনেকে এসেছে। ছাত্রদের কেউ আগেই শিখিয়ে দিয়েছে। কেউই তিনকড়িকে বললো না যে তাঁর বাবা গাড়ি চাপা পড়েছে, এই মুহূর্তে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়।

জ্বরের ঘোরে তখন তিনকড়ি কিছু বুঝতে পারছেন না। তিনি ছেলেদের সঙ্গে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেদিনের সব ঘটনা এখন আর ভাল করে মনে পড়ে না। গায়ে চার ডিগ্রি জ্বর নিয়েই হাসপাতালে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনকড়ি। তখন বাবার প্রায় শেষ মুহূর্ত। এক বিন্দুও জ্ঞান ছিল না।

ইস্কুল থেকে একজন দপ্তরি গিয়ে সখিপুর থেকে মা, ঠাকুমা আর বোনেদের নিয়ে পরের দিন এসেছিলো।

তার আগেই ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে সিটি কলেজিয়েট স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের মুখাগ্নি করেছিলেন পুত্র তিনকড়ি। সব কিছু জ্বরের ঘোরে কেমন ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে। ঘাম হচ্ছে, জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। চিতার আগুন, ধোঁয়া। ব্রহ্মপুত্রের জল, শীতল বাতাস।

বাবার মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে ঠাকুমা অহল্যা নদীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে মারা গেলেন।

ইতিমধ্যে তিনকড়ি শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছেন। পাশের গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছেন। সংসারের সমস্ত ঝামেলা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে।

তিনকড়ির মা ইন্দুমতী ছিলেন খুব সরল, সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে হাবাগোবা বললে বিশেষ বেশি বলা হয় না। গ্রামের লোকেরা তাই তাঁকে ভাবতো।

পাগল শাশুড়ির দাপটে ইন্দুমতী ভয়ে জড়সড় থাকতেন। কিন্তু শাশুড়ির মৃত্যুর পরেও তিনি সংসারি হয়ে উঠতে পারেননি।

ইন্দুমতীর খাওয়া-দাওয়া চিরদিনই খুব কম ছিল। বিধবা হওয়ার পরে খাওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছিলেন।

শাশুড়ি আগাগোড়া সধবার মত সাজসজ্জা করেছেন, মাছ খেয়েছেন। ইন্দুমতী বৈধব্যের পরে তো বটেই, বৈধব্যের আগেও বিধবা ননদের সঙ্গেই বেশি খেতেন।

তিনকড়ির পিসি তাঁর ভ্রাতৃবধূকে খুবই স্নেহ করতেন। বিধবা ভ্রাতৃবধূর জন্যে নানা রকম রান্না করতেন। লাউ দিয়ে মুগের ডাল, থোড় ঘণ্ট, সজনের ডাঁটার ঝাল, আমের কুষির হালকা অম্বল। সম্বৎসরে খেত থেকে পাওয়া ডালের বস্তা, চালের বস্তার তলানি জলে ভিজিয়ে শিলনোড়ায় বেটে ধোঁকা হতো, চাপর ঘণ্ট হতো। বাড়ির ডোবার ধারে মানকচুর ঝাড় ছিলো, তার পিছনে বেতঝোপ ছিল।

তিনকড়ির মনে আছে লাল ছোলা দিয়ে কালোজিরে ভাজা ছিটিয়ে তার সঙ্গে দু'টো শুকনো লঙ্কা দিয়ে মানকচুর ঝাল। আর সেই অমৃত আস্বাদ বেতডগার শুকতো ঝোলের। কিন্তু ইন্দুমতীর স্বাদ-গন্ধ কোনো কিছুতেই আকর্ষণ ছিলো না। সকাল থেকে প্রায় কিছুই খেতেন না। বেশি বেলায় এক মুঠো আতপান্ন। ননদ জোর করে এটা-ওটা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। সেই কচি বেতলতার হালকা ঝোল, লাউয়ের খোসার ছেঁচকি, ডোবার ধারের নধর কলমি লতার শাকভাজা।

এসব কিছুতেই রুচি নেই ইন্দুমতীর। একটা কাঁচালঙ্কা, এক চিমটি নুন আর একটু সরষের তেল তাই দিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে অল্প অল্প খেয়ে, তিনি কোনো রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। তবে এভাবে বেঁচে থাকা কঠিন।

একালে হলে হয়তো ডাক্তার ক্যানসার বলতো। সাপাইলের দুর্লভ কবিরাজ বলেছিলেন অগ্নিমান্দ্য। ইন্দুমতীকে পরীক্ষা করে দেখে এই রায় দিয়েছিলেন। তিনি হরতুকি, আমলকি, কালমেঘ ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি গোল গোল কালচে বড়ি দিয়েছিলেন ইন্দুমতীকে খেতে। সে অবশ্য ইন্দুমতী খাননি। অবশেষে দুর্লভ কবিরাজ ঘোষণা করেছিলেন, 'কর্কট রোগ'। এর চিকিৎসা আগে আয়ুর্বেদে ছিলো, কিন্তু পাঁচশো বছর আগে সেই পৃষ্ঠাগুলো হারিয়ে গেছে। রুদ্রপ্রয়াগে ভিষগ উদ্যানের চাতালে ভিষগ বিদ্যায় মহাশাস্ত্রী শিষ্যদের কর্কট রোগ নির্ণয়, নিরূপণ এবং চিকিৎসা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় প্রয়োজনীয়

পৃষ্ঠাগুলি উড়ে যায়।

শিষ্যেরা অনেকেই উড়ো কাগজের পিছনে দৌড়েছিলো।

কিন্তু কোনো সুবিধে হয়নি।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অতিক্রম করে তালপাতার পুঁথির সেই ভারি পৃষ্ঠাগুলি মহাশূন্যে উঠে গিয়েছিলো।

দুর্লভ কবিরাজ বলেছিলেন, 'স্বয়ং দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার সেই পৃষ্ঠাগুলি ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন।'

ইন্দুমতী দেবী আর বাঁচলেন না। তবু এরই মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটেছিলো। ইন্দুমতীদেবীর মৃত্যুর বছরে তিনকড়ি মাইনর পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মাইনর ছিলো উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা। মাইনর স্কুল ছিলো গ্রামে, তাতে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ানো হতো। অশৌচ কালেই পরীক্ষা পাশের সংবাদ তাঁর কাছে এসেছিলো। তিনি দ্বিতীয় ডিভিশনে তখনকার সেই মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মাইনরে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া খুব কঠিন ছিলো। পুরো জেলাতে বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট জন ফার্স্ট ডিভিশন পেতো।

এই সময়েই ইন্দুমতীর মৃত্যুর আগেই তিনকড়ির পিসতুতো দাদা সদানন্দ একটি চাকরি পান। কয়েক বছর আগে ম্যাট্রিক পাস করে সদানন্দ বাসায় বসে ছিলেন। সদানন্দের এক জ্যাঠামশায় ছিলেন কলকাতায় রাইটার্স বিলডিংসে কৃষি দপ্তরের বড়বাবু। তিনিই চেষ্টাচরিত্র করে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যে সরকারের জুট রেগুলেশন দপ্তরে একটা কাজ সংগ্রহ করলেন। প্রথম পোস্টিং সিরাজগঞ্জে। মাস মাইনে বাইশ টাকা। দুবছর পরপর এক টাকা ইনক্রিমেন্ট।

সিরাজগঞ্জ সখিপুর থেকে দূরে নয়। কয়েক ক্রোশ রাস্তা আর দুটো বড় নদী পেরোলেই পৌঁছানো যায়।

ইন্দুমতীর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পরে সদানন্দ কাজে চলে গেলেন

আর তাঁর মা শক্ত হাতে নাবালক অনাথ ভাইপোর সংসারের হাল ধরলেন।

তিনকড়ির পিসির নাম ছিলো নিভারাণী দেব্যা। সখিপুরের লোকেরা বলতো নিভা ঠাকরুণ, কেউ কেউ গ্রাম সুবাদে পিসিমাও বলতো।

যে যাই বলুক সবাই তাঁকে সমঝিয়ে চলতো।

এত দিন পরে পিসিকে, তিনকড়ির খুব মনে পড়ে। পিসি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। দুর্দিনে পাখির মায়ের মত রক্ষা করেছেন।

বাবা মরে যাওয়ার পরে যে ছয়শো টাকা পাওয়া গিয়েছিলো, তার মধ্যে শ খানেক টাকা খরচ হয়েছিলো নানা কাজে, বিশেষ করে বাবার শ্রাদ্ধে।

বাকি পাঁচশো টাকাই নিভারাণী উদ্যোগ নিয়ে সাপাইল ডাকঘরে জমা রেখেছিলেন, বছরে শতকরা দেড় টাকা সুদ। সুদটা বড় কথা ছিলো না, নিরাপত্তাটা বড় কথা ছিলো।

ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর এক বছরের মাথায় এক অসাধ্য সাধন করলেন নিভারাণী। তিনকড়ির বড়দি পদ্মাবতী আর ছোড়দি যমুনাবতী দুজনের একই দিনে একই লগ্নে জোড়া যমজ ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

অহল্যা নদীর ওপারে অল্প কয়েক ক্রোশ দূরে মির্জানগর। গ্রামের নাম মুসলমানী, কিন্তু গ্রামটি ব্রাহ্মণ প্রধান। ঠিক টুলো বামুন বা পূজারি বামুন নয় রীতিমত প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণদের বাস। এখানকার চক্রবর্তী বাড়ির এক ছেলে পুলিশে বড় দারোগা, আরেক ছেলে জেলা সদরে মোক্তার।

এই চক্রবর্তীবাড়িরই আরেক জ্ঞাতিবংশ, তারা তেজারতি কারবার করে। তাদের বাড়িতে যমজ ছেলে, গৌর-নিতাই, বয়েস একুশ। লেখাপড়া বিশেষ করেনি কিন্তু নিজেদের কাজ-কারবার দেখাশোনা করে। মোটামুটি ভাল দেখতে।

পদ্মাবতী ও যমুনাবতী দুজনেই টানটান সুন্দরী। একজনের বয়েস

ষোলো, একজনের চৌদ্দো-পনেরোর মাঝামাঝি।

এছাড়া তিনকড়িদের বংশমর্যাদা আছে। তাঁর পিতামহ খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন।

তখনকার দিনে বিয়ের ব্যাপারে বংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো, তার পরে পাত্রীর চেহারা। টাকা-পয়সা, লেনদেন ছিলো কিন্তু দৃষ্টিকটু ছিল না। মর্মান্তিক ছিল না।

কয়েকবার যাতায়াত করে, একে-ওকে ধরাধরি করে ভাইঝিদের বিয়েটা দিয়ে ফেললেন নিভারাণী। ডাকঘরে সঞ্চিত অর্থ থেকে শ চারেক টাকা ব্যয় হলো।

দুই ভাইঝির বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিভারাণী স্থির করলেন, অনেক কাল পিত্রালয়ে হলো এবার ছেলে কাজ পেয়েছে তার কাছে গিয়ে থাকি।

নিভাঠাকরুণের এই শেষ ইচ্ছা কিন্তু পূরণ হয়নি।

আসলে সে সময়ে সখিপুরের পণ্ডিত বাড়িতে মৃত্যুযোগ লেগেছিলো। মায়ের মতই হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে বিনা নোটিশে নিভারাণী দেহত্যাগ করলেন।

তিনকড়ির বয়েস তখন তেরো, তিনকড়ির ছোট বোন কমলাবতীর বয়েস এগারো।

তিনকড়ির দিদি-জামাইবাবুরা মির্জানগর থেকে এসে কমলাবতীকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনকড়িকেও নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু তিনকড়ির আত্মসম্মানে লেগেছিলো, তিনি যাননি।

বাবার সঙ্গে ময়মনসিংহ থাকায় সময় ভাত ফোটানোর শিক্ষা তাঁর হয়েছিলো। তিনি নিজেই নিজের রান্না করে খেতে লাগলেন। সাপাইলে হাই ইস্কুলে পড়তে লাগলেন, ম্যাট্রিক পাস করলেন, সেও তৃতীয় বিভাগে। এর পর প্রায় পনেরো বছর পার হয়ে গেছে।

নিঝুমপুর ঘাটের ডাকঘরে বসে একেক সময় তিনকড়ি সেই সব পুরনো দিনের কথা ভাবেন।

সেই ময়মনসিংহ শহরে হেমনগরের কাছাবি, বাবা তোলা উনুন ধরাচ্ছেন। বেগুন পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কী বড় বড় বেগুন পাওয়া যেতো নতুনবাজারে ময়মনসিংহে, একেকটার আধ সের, তিন পোয়া ওজন। ব্রহ্মপুত্রের চরে হতো।

কখনো কখনো ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। চেলা কাঠ হতে অহর্নিশি অহল্যা নদীর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন।

মায়ের কথা খুব করে মনে আসে। নিরভিমান, নির্বাক জীবনযাপন। গাছের হলুদ পাতার মত কেমন নিঃশব্দে ঝরে গেলেন।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কাল রাতে ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে পিসির কথাই বেশি করে মনে পড়ছে।

গুহবাড়ির পিছন দিকে একটা বিশাল ঘোড়ানিম গাছ আছে। কাল রাতের ঝড়ে তার বড় একটা ডাল ভেঙে গেছে। আর সমস্ত উঠোন জুড়ে ঘোড়ানিমের সাদা ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

পিসির সারাদিনই প্রায় কাটতো হবিষ্যি ঘরে। সেখান থেকেই সকলের রান্না হতো, সবই নিরামিষ। ঠাকুমা বেঁচে থাকতে একটু মাছ রান্না হতো, সেটা বড়দি পদ্মাবতী করতেন।

পিসি হবিষ্যি ঘরে একটা ছোট জলচৌকির ওপর বসে রান্না করতে করতে সংসার পরিচালনা করতেন।

হবিষ্যি ঘরটা ছিলো একটা নিমগাছের নিচে। গরমের দিনগুলোতে সাদা নিমফুল ঝরে পড়ে থাকতো হবিষ্যি ঘরের সামনের উঠোনে, সিঁড়িতে বারান্দায়, টিনের চালে।

তিনকড়ি আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো প্রথম বাস আসার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নিঝুমপুর ঘাটের দিকে রওনা হলেন।

বৈশাখ মাসে রৌদ্রের তাপ ভোরবেলাতেই চড়ে যায়। সন্তর্পণে ঘোড়ানিম গাছের ভাঙা ডালটা ডিঙিয়ে তিনকড়ি কাজের জায়গায় রওনা হলেন। আজ চিঁড়েভেজা খাওয়া হল না, মিষ্টির দোকান থেকে দুটো রসগোল্লা খেয়ে নিলেই হবে।

(তিন) ভালাবাসা

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে,
তোমারে করেছে রানী,
তোমারই দুয়ারে কুড়াতে এসেছি
ফেলে দেওয়া মালাখানি!

দত্তদের ছোটতরফের বাড়িতে রেডিয়ো শুনতে গিয়ে একদিন খুব অপমানিত হয়েছিলেন তিনকড়ি সান্যাল। আসলে সেদিন স্টিমারঘাটে গঞ্জ থেকে আসা যাত্রীরা বলাবলি করছিলো, রেডিয়োতে নাকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জাপান না জার্মানি কোন এক বিদেশি শব্দতরঙ্গে নেতাজির বক্তৃতা শোনা গিয়েছিলো। আজও নাকি শোনা যাবে।

এই নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা সেদিন। অবশ্য কখনো কখনো, কখনো কখনো কেন প্রায় অধিকাংশই সময়েই এরকম খবর ঠিক হতো না। নানারকম গুজব রটে যেতো।

সময়টা খুব গোলমেলে। মিত্রপক্ষ মানে ইংরেজরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জিততে জিততে আটকিয়ে গেছে। নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন। নতুন স্লোগান বেরিয়ে এসেছে, জয় হিন্দ।

ইউরোপের রণাঙ্গনে সাম্যবাদী রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে।

তিন বছর আগে কংগ্রেস যে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের' ডাক দিয়েছিলো, তা এতদিনে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে একটা মহামন্বন্তর হয়ে গেছে। কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে। শহর-গঞ্জের সাধারণ লেখাপড়া জানা, খবরের কাগজ পড়া, রেডিয়ো শোনা মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত,

ইংরেজ পক্ষ জিতলেই ভাল হবে নাকি হারলে ভাল হবে। স্বাধীনতা কতদূরে?

একটা কথা কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছে ইংরেজদের দিন শেষ হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসন্ন সূর্যাস্তের হলুদ আলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে।

কিন্তু এখনো ইংরেজ অনুরাগীদের অভাব নেই। তার মধ্যে যেমন উচ্চশিক্ষিত লোকেরা আছেন, যাঁরা মনে করেন ইংরেজ বিদায় নিলে দেশ জাহান্নামে যাবে তেমনই দত্তবাড়ির ছোট তরফের মত লোকেরা আছেন যাঁরা রাজতন্ত্রের প্রসাদপ্রত্যাশী।

ঠিক এখানেই ভুল করেছিলেন তিনকড়ি সান্যাল।

তিনকড়ি সেদিন স্টিমারযাত্রীদের কাছে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথা শুনে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এক বাটি ছাতুগুড় খেয়ে ছোটতরফের ওখানে গিয়েছিলেন।

যখন যান, অক্ষয় গুহের ভাই-বৌ তাঁর পায়ের শব্দ শুনে প্রদীপ হাতে আলো দেখানোর জন্যে উঠোনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো।

হঠাৎ তিনকড়ি সান্যালের মনে হলো, চাপা কণ্ঠে একটি জিজ্ঞাসা যেন শোনা গেলো, কোথায় যাচ্ছেন?

প্রদীপেব নিচেই শুধু অন্ধকার নয়, প্রদীপের পশ্চাতেও অন্ধকার। বামাকণ্ঠের অধিকারিনীকে এখনো চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়নি সান্যাল মশায়ের।

আজ 'কোথায় যাচ্ছেন' এই প্রশ্ন শুনে একটু থমকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনকড়ি। এই বৌটি এর আগে কখনো তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। অবশ্য তিনিও সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে কখনো বেরোন না।

তবে আজকের এই প্রগলতার অন্য একটা কারণ থাকতে পারে।

নিঝুমপুর থেকে দেড় ক্রোশ দূরে ইলশা গ্রামে গুহদের আদি নিবাস। ঘরজামাই হিসেবে তারা এখানে এসে এই নিঝুমপুরে বাসা বাঁধে। এখন দৌহিত্র এবং প্রদৌহিত্র প্রজন্ম চলছে। কিন্তু ইলশা গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ, সামাজিক সম্পর্ক মোটেই বিচ্ছিন্ন হয়নি।

ইলশা গ্রামে আজ এক অন্নপ্রাশনের উৎসব। সকাল বেলাতেই

নিঝুমপুরের ঘাট থেকে নৌকোয় করে এবাড়ির সবাই চলে গেছে। বাড়িতে গৃহকর্তার বৃদ্ধা ঠাকুমা রয়েছেন, বোধ হয় নব্বুইয়ের কাছে বয়েস, বিধবাই হয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর। আর সেই বৃদ্ধাকে দেখাশোনা করার জন্যে এই বৌটি রয়ে গেছে।

বৌটির নাম তরলা। যদিও সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, এ বাড়িতে থাকতে থাকতে তরলার নাম তিনি জেনে গেছেন।

তিনকড়ি এটা বুঝতে পেরেছেন যে এ বাড়ির সবাই সদাসর্বদা ঘরকন্নার সবরকম কাজে তরলার ওপর নির্ভর করে।

...'তরলা গোপালকে স্নান করিয়ে দাও।'...

...'তরলা কর্তার হাত-পা ধোয়ার জল উঠোনে দাও।'...

...'তরলা সরষে বাটতে হবে।'...

...'তরলা আজ বিকেলে মুড়কি করতে হবে, বাজার থেকে গুড় আনতে হলে বলে দাও।'...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তিনকড়ি বুঝে গেছেন, এ বাড়ির সব কিছুর জন্যেই তরলা। তবু এ বাড়িতে তরলার অবস্থানটা যে ঠিক কোথায় বুঝে উঠতে পারেন না তিনকড়ি। বাড়ির বৌ অবশ্যই, কিন্তু একটু হেলাফেলার ব্যাপার আছে।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে বাধা পড়ায় তিনকড়ি একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তরলা আলো হাতে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখান থেকেই বললো, 'খালি বাড়িতে আমি একা রয়েছি, দিদিশাশুড়ি সন্ধ্যা থেকে ঘুমোচ্ছেন।'

তিনকড়ি বললেন, 'আমি এখনই আসছি। ছোটতরফদের বাসায় একবার যাবো। শুনলাম সুভাষ বোস বক্তৃতা করবেন রেডিয়োতে, দেখি যদি শোনা যায়।'

তরলা বললো, 'রেডিযো তো আমাদের উঠোন থেকেই শোনা যায়।'

কথাটা সত্যি। যদিও রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে পুরো পাড়াটা ঘুরে যেতে হয়, দত্তদের ছোটতরফ আর এ বাড়ির মধ্যে মাত্র একটা ডোবার ব্যবধান। কচুরিপানা আর কলমিদামে ভর্তি একটা মাঝারি আকারের পুকুর ছোটতরফের বাড়ির দক্ষিণে আর এই গুহবাড়িব উত্তরে। পুকুরের পাড় ঘিরে সুপুরি গাছের সারি। কোনো পায়ে চলার পথও নেই।

ছাইগাদা, আবর্জনার স্তূপ। খাটা পায়খানা।

এদিকে-ওদিকে মানকচুর ঝোপ। বেতের জঙ্গল। কয়েকটা জিগা গাছ, একটা কামরাঙা। দিনের বেলায় কানাকুয়ো পাখি কুব্-কুব্ করে ডাকে। সন্ধ্যায় ভুতুম চেঁচায়।

ছোটতরফের দিকে ঘাটলার পাশে বোধহয় কয়েকটা সজনে গাছ আছে। শীতের শেষ দিকে যখন তিনকড়ি এখানে এসেছিলেন উত্তরের বাতাসে হালকা গন্ধ পেয়েছেন সজনে ফুলের। জোর হাওয়ায় কিছু কিছু সজনে ফুল এ বাড়ির উঠোনে এসেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ও বাড়ির রেডিয়োর গান-বাজনা, কথাবার্তা, নিঝুমপুর যখন সত্যিই নিঝুম হয়ে যায়, সন্ধ্যার পর, এ বাড়ির উঠোনের মাথা থেকে স্পষ্ট শোনা যায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনকড়ি। হু হু করে বাতাস আসছে নদীর দিক থেকে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এ বাতাসের স্বাদই আলাদা। শুধু সারাদিনের তীব্র দহন নয়, মনে হয় যেন জন্মজন্মান্তরের গ্লানি মুছে দেয় এই নির্মল বাতাস।

কাল রাতের কালবোশেখির পরে আজ সকালবেলায় বেশ ঠাণ্ডাভাব ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তে বাতাস থেমে গেলো। সূর্য চড়চড়িয়ে উঠতে লাগলো আকাশে। চারদিক থমথম করতে লাগলো গুমোটে। এরই মধ্যে বাস এসেছে, গিয়েছে। ঘড়ি মিলিয়ে তিনকড়ি কাগজে সই করে দিয়েছেন। তারপরেও নদীর তীরের বালুচরের গনগনে আঁচের পাশে দাঁড়িয়ে পোস্টাফিসের কাজ করতে হয়েছে।

তবে পোস্টাফিসে কাজ খুব কম। কিন্তু লোকেরা বেশ বিরক্ত করে।

'মাস্টার মশায়, আমার কোনো চিঠি নেই?'

'কি নাম?' তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করেন।

'অনিল বসাক। আমার পরিবার দিগম্বরী দাসীর নামেও চিঠিটা আসতে পারে।'

একটু আগে আসা, বেছে এবং সাজিয়ে রাখা ডাকের চিঠিগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের গ্রামের নাম কি?'

অনিল বসাক এখনো বলে চলেছেন, 'আমার মা দেবদাসী দাস্যা, তার

নামেও চিঠি আসতে পারে। আমার মেয়ে তার ঠাকুমাকে খুব যে ভালবাসে।'

বিরক্ত বোধ করেন তিনকড়ি। আবার প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের গ্রামের নাম বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই নিজের রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনে লজ্জিত বোধ করেন।

'মাস্টার সাহেব, আমি তার করবো।'

গাট্টাগোট্টা দাড়িওলা বুড়োটা অবশ্য 'তার করবো' বলেনি। বলেছিলো, 'তার করুম'।

এ ভাষা তিনকড়ি বোঝেন না তা নয় এটা তাঁরও নিজের ভাষা, মাতৃভাষা। এ ভাষায় ঝরঝর করে তিনি কথা বলতে পারেন।

তা, সেই দাড়িওলা বুড়ো আজ সারাটা দুপুর তাঁকে জ্বালিয়েছে। টিনের চালার নিচে অগ্নিতপ্ত মধ্যাহ্ন জুড়ে ব্যাজোর ব্যাজোর করেছে বুড়ো, বুড়োর ছেলে চাকরির খোঁজে চট্টগ্রাম গিয়েছিলো। সেখান থেকে নাকি জাহাজে কাজ নিয়ে বিলাতে যায়। বিলাত থেকে ছেলের খবর আসেনি আজ পাঁচ বছর।

তিনকড়ি বুড়োকে বোঝান, খুব যুদ্ধ হচ্ছে বিলাতে। চিঠিপত্র যাতায়াত খুব কম।

বুড়ো জোর করে তার করবে। তিনকড়ি বোঝান যে তাঁর এখানে টরে-টক্কার অর্থাৎ তারের ব্যবস্থা নেই। তার করতে হলে কাছারি টাউনে সদর ডাকঘরে যেতে হবে।

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ো শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলো।

তারপরেও হাঙ্গামা ছিল। সনাতন হরকরা আজকের স্টিমারেও মেলব্যাগ নিয়ে যায়নি। সকাল বেলাতেই ডাকের থলে তাঁর কাছে রেখে বেরিয়ে ছিলো। স্টিমার এসে চলে গেছে তার পাত্তা মেলেনি। পোস্টাফিস বন্ধ করার সময় পর্যন্ত তার দেখা মেলেনি। নিশ্চয় আবার গাঁজার আড্ডায় ফেঁসে গেছে।

এদিকে আজ দুদিকের লাস্ট বাসই দেরি করে এসেছে। বাসরাস্তার ওপরে কোথায় নদীর চরে বোশেখি মেলা বসেছে। শেষ বাসের টাইম দিয়ে সনাতনের মেলব্যাগ নিয়ে একটু আগে ঘামে ভেজা, রোদে পোড়া তিনকড়ি ফিরেছেন। এতক্ষণে ভেজা গামছায় শরীর মুছে ঝিরঝিরে বাতাসে একটু স্বস্তি পাচ্ছেন।

কিন্তু তরলার কথা শুনে এখন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন তিনকড়ি সান্যাল। তিনি এ অঞ্চলে নবাগত। ভাড়া থাকেন এই গুহবাড়ির বাইরের ঘরে। অন্দরমহলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই।

খালি বাড়ি। অন্ধকার, শুনশান।

তরলাই বললো, 'ওনাদের ইলশা থেকে আসতে রাত নয়টা-দশটা হয়ে যাবে। সব কাজ মিটিয়ে আসবে তো।'

এর পরেই তরলা তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে বললো, 'ছোটতরফের বাড়িতে যাবেন না। ওরা লোক ভালো নয়।'

তিনকড়ি কিন্তু তরলার নিষেধ শুনলেন না। তাঁর এমন সাহস নেই যে অর্ধপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে নির্জন বাড়ির মধ্যে এই অন্ধকার একা থাকেন।

তরলাকে কিছু না বলে তিনকড়ি ছোটতরফের বাড়িতে রেডিয়ো শুনতে গেলেন।

গুহবাড়ির অন্দরমহল আর বাইরের অংশের মধ্যে একটা পাটকাঠির বেড়া। বেড়ার মাঝখানে কেরোসিনের রাজমুকুট মার্কা টিন কেটে জুড়ে নড়বড়ে দরজা। তিনকড়ি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সেই দরজায় আলো হাতে দাঁড়িয়ে থাকে তরলা।

তবে তরলা যে ছোটতরফের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছিলো, তার সেই সাবধানবাণী সঠিক ছিলো।

এই অঞ্চলে বাইরের ঘর বা বৈঠকখানা ঘরকে কাছারি ঘর বা কাছারি বাড়ি বলে।

ছোটতরফের কাছারি ঘরটি বেশ বড়। টিনের চারচালা ঘর। মেঝে, দেয়াল সিমেন্টের। ঘরের মধ্যে টানা তক্তাপোষ, পাতলা তোষক ও সাদা চাদরে ঢাকা। তক্তাপোষের ওপরে এদিকে ওদিকে কয়েকটা তাকিয়া।

সন্ধ্যাবেলায় এ ঘরে একটা ছোট হ্যাজাক জ্বালানো হয়।

বারান্দায় হুঁকোর বন্দোবস্ত রয়েছে। চাররকম হুঁকো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান ও অন্যান্যদের জন্যে আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত। হুঁকো ধরানোর টিকে, নালিগুড় দিয়ে মাখা দা-কাটা তামাক, এমনকি একটা মাটির মালসায় কাঠ কয়লার আগুন রয়েছে টিকে ধরানোর জন্যে।

বেশ ভালো বন্দোবস্ত। কিছুটা তামাকের লোভে, কিছুটা ছোট তরফের ক্ষমতাশালী বড় কর্তা পরাণ দত্তের খোশামদি করতে দুচারজন গ্রামবৃদ্ধ সন্ধ্যাবেলা এখানে জোটেন। দুচারজন তদ্বির তদারকি করতেও এপাড়া ও পাড়া থেকে আসেন।

পরাণ দত্ত ডাক্তার পরেশ দত্তের জ্ঞাতি ভাই—জ্যাঠতুতো দাদা। এই দত্তবাড়ির পুরুষ মানুষদের সকলেরই নামের আদ্যকর প, যেমন পরেশ, পরমেশ, পরাণ বা প্রাণ, প্রফুল্ল, প্রেমেন্দ্র। নামগুলো স্বমিল না হলেও ইংরেজিতে সবাই পি দত্ত।

এই কাছারি ঘরেও একটা ছোট সাইনবোর্ড লাগানো আছে।

P. Datta and Sons
General Merchants.

পরাণ দত্তের বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। তা পরেশ ডাক্তারের চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড় হবেন। লম্বায়, চওড়ায় দশাসই, রাশভারি চেহারা। কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর। ব্যবসা করে বিশেষত এই যুদ্ধের বাজারে মিলিটারির কল্যাণে প্রচুর অর্থ করেছেন। কলকাতায়, ঢাকায়, জেলাসদরে বাড়ি করেছেন। মেয়েরা বোর্ডিংয়ে থেকে ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী ইস্কুলে পড়ে। একই ছেলে কলকাতায় এম এ পড়ছিলো। যুদ্ধের বোমার ভয়ে এখন ঢাকায় পড়ছে।

পরাণবাবুর কাছারি ঘরে তখন তিন চারজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে গল্প গুজব করছেন। তামাকের ধোঁয়া উড়ছে।

এঁরা যুদ্ধের বিষয়ে কী আলোচনা করছিলেন। তিনকড়ি সান্যালকে দেখে আলোচনা হঠাৎ মধ্যপথে থেমে গেলো।

এঁরা প্রত্যেকেই তিনকড়িকে মোটামুটি চেনেন। যদিও তিনি বেশিদিন এ অঞ্চলে আসেননি, তবুও গাঁয়ের পোস্ট মাস্টারকে সবাই চিনে

ফেলে।

বুড়োরা তিনকড়িকে এখানে আসতে দেখে খুশি হননি। পাড়াগাঁয়ের এই নিষ্কর্মা বৃদ্ধেরা খুবই সঙ্কীর্ণমনা হয়। সারা জীবন কিছুই করেননি। প্রপিতামহের অর্জিত জমিজমার ওপরে নির্ভর করে সমাজে পরগাছার মত বেঁচে থেকেছেন। অসূয়াযুক্ত, সন্দেহপ্রবণ মন এঁদের।

এই তিন-চার জনের মধ্যে একজনের নাম তিনকড়ি জানেন, গোরাচাঁদ চক্রবর্তী— মকদমপুরের পাশের গ্রাম শীতলপুরের।

গোরাচাঁদবাবু লোক সুবিধের নন। নিজে উদ্যোগী হয়ে নিঝুমপুর ঘাটে এসে শীতলপুরের সব চিঠি তিনি তিনকড়ির কাছ থেকে নিয়ে যেতেন। একটু বেশিই উৎসাহ ছিলো এ ব্যাপারে তাঁর।

কিন্তু একদিন গোরাচাঁদবাবুর ছোট ভাই তারাচাঁদ চক্রবর্তী এসে বলে গেলেন, 'আমার নামে কোনো চিঠি এলে দাদার হাতে দেবেন না। আপনি রেখে দেবেন, আমি যখন পারি নিজে এসে নিয়ে যাবো।'

আজ কিন্তু গোরাচাঁদবাবু তিনকড়িকে দেখে মনে হলো চিনতেও পারলেন না। বরং অন্য এক আধচেনা ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বললেন, 'আসুন মাস্টার মশায়। বসুন। তামাক চলবে তো?

তিনকড়ি ফরাসের এক পাশে বসলেন। তারপর বললেন, 'তামাক থাক।'

এবার গোরাচাঁদবাবু মুখ খুললেন। বললেন 'কেন? তামাক খান না?'

তিনকড়ি বললেন, 'খাই। অল্পস্বল্প খাই। আপনারা প্রবীণ ব্যক্তিরা এখানে রয়েছেন। আপনাদের সামনে তামাক সেবন করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার গোরাচাঁদবাবু প্রশ্ন করলেন, 'পরানের কাছে কোনো কাজে এসেছেন?'

তিনকড়ি বললেন, 'ঠিক কোনো কাজে নয়। শুনলাম রেডিয়োতে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করবেন। এ বাড়িতে রেডিয়ো আছে। তাই এলাম, যদি শোনা যায়।'

গোরাচাঁদবাবু বললেন, ' রেডিয়ো তো বাড়ির মধ্যে। ছোটকর্তা মানে

আমাদের পরাণের শোবার ঘরে।' তারপর গলা নামিয়ে প্রায় থিয়েটারি কায়দায় ভ্রূকুঞ্চন করে ষড়যন্ত্রমূলক কণ্ঠে বললেন, 'মিলিটারির ঠিকেদার বাড়িতে সুভাষ বোস।'

ইতিমধ্যে পরাণ দত্ত কাছারি ঘরে এসে গেছেন। পাটভাঙা ধুতি। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। হাতে একটা রুপোর কৌটা। তার মধ্যে অনেকগুলো পানের খিলি, যথেচ্ছ খান, যথেচ্ছ বিলোন।

প্রতিদিন বাজার থেকে এক বিড়া পান, মানে একশোটা বড় বড় গোল, টসটসে, বাছাই পান কেনেন ছোটতরফের ছোটকর্তা নিজে দাঁড়িয়ে। প্রতিটি পান থেকে দুটি কি তিনটি খিলি। কুচি-কুচি করে কাটা বাড়ির গাছের সুপুরি, জনকপুরী খয়ের, বাড়ির পুকুর থেকে চৈত্রমাসে কাদা ঘেঁটে তোলা ঝিনুকের চুন এই দিয়ে আসল পান।

সেই সঙ্গে প্রতিটি পানে দোক্তা। মৌরি ভাজা, ধনে ভাজা, মতিহারির তামাক পাতা ভেজে গুঁড়ো করা চুয়া চন্দন দিয়ে মাখা। অতিশয় সুগন্ধি ও সুস্বাদু এবং ধ্বকও কিছু কম নয়। কোনো আনাড়ি খেলে বা পানের পিক গিলে ফেললে মাথা তো ঘুরবেই, বমিও হতে পারে।

পরাণবাবু কাছারি ঘরে ঢুকে প্রথমেই পোস্টমাস্টার তিনকড়িকে দেখলেন। নদীর ঘাটে, বাস রাস্তার ধারে নৌকো বা ট্রাকে মাল ওঠা-নামানোর তদারকি পরাণবাবু অনেক সময় নিজেই করেন।

মিলিটারির জিনিসপত্র সরবরাহ করার কাজ, ভাল লাভ আছে। কিন্তু ঝামেলাও কম নয়। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ।

তিনকড়িকে দেখে পরাণবাবু বললেন, 'এই যে মাস্টারমশায় যে হঠাৎ, কোনো চিঠিপত্র আছে নাকি?' এই বলে পানের ডিবে খুলে মাস্টারমশায় সমেত উপস্থিত সকলকে পান এগিয়ে দিলেন।

তিনকড়ি ভদ্রতার খাতিরে একটা পান তুলে নিলেন।

তবে তিনকড়ির পরাণবাবুর ভঙ্গিটা মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি কি ডাকপিয়ন লোকের বাড়িতে বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দেবেন!

কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই গোরাচাঁদবাবু বললেন, 'মাস্টারমশায়, তোমার এখানে বেড়িয়োতে সুভাষ বসুর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন।'

'সুভাষ? সুভাষ কে?' পরাণবাবু বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন।

এ কথা বুঝতে তিনকড়িবাবুর মোটেই অসুবিধে হল না যে তাঁর বাড়ির বেতার যন্ত্রে যে নেতাজি সুভাষের ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা হবে এরকম হাস্যকর চিন্তা না থাকাই ভাল।

পরাণবাবু অবশ্য এর পরে আরও এক কাঠি ওপরে চলে গেছেন, বললেন, 'তা ছাড়া আমার রেডিয়ো তো সাতদিন বন্ধ। রেডিয়োর ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে, কাছারি-টাউনে পাওয়া যাচ্ছে না, জেলা সদর থেকে কিংবা ঢাকা থেকে আনতে হবে।'

কথাটা ডাহা মিথ্যে। এই একটু আগে গুহবাড়ির বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে একটা নতুন গান শুনেছেন রেডিয়োর। সন্ধ্যার নিঝুম পল্লীতে পচাডোবা পেরিয়ে গুহবাড়ির অন্দরমহল পেরিয়ে, পাটকাঠির বেড়ার ফাঁক দিয়ে গানের কলি ভেসে এসেছিল,

'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানী।'

এ গানের অবশ্য কোনো মানে নেই তিনকড়ি সান্যালের কাছে, যাকে প্রেম বা ভালবাসা বলে তার এই তিরিশ বছরের দারিদ্র্য-কণ্টকিত জীবনে তার কোনো স্পর্শ মেলেনি। কিন্তু গানটা বড় ভাল। সুর আর ভাষা, কেমন মন খারাপ করে দেয়। কিসের জন্যে, কার জন্যে মন খারাপ, কেউ কোনো দিন জানে না, নিঝুমপুর ব্রাঞ্চ পোস্টাফিসের টেম্পোরারি সাব পোস্টমাস্টার তিনকড়ি সান্যালও জানেন না।

ছোটতরফের কাছারি ঘর থেকে একটুখানি অপমানিত হয়েই নিঃশব্দে ফিরে এলেন তিনকড়ি। তাঁর এটা আগেই বোঝা উচিত ছিলো যে সরকারি ঠিকাদারের বাসায় সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা খুবই বিপজ্জনক।

তা ছাড়া তিনকড়ি হলেন, যত ছোট মাপেরই হোক না, রাজপুরুষ। বাসায় সন্ধ্যাবেলা বসে সুভাষচন্দ্রের নিষিদ্ধ বক্তৃতা শোনার কথা সদরে পৌঁছাতে কতক্ষণ।

চারদিকে এখন কত স্পাইয়ের ছড়াছড়ি। তিনকড়ি তো পুলিশ বা মিলিটারি স্পাইও হতে পারে।

ছোটতরফের কর্তার দোক্তা দেওয়া পানটা খাওয়া উচিত হয়নি। জিনিসটা অভ্যেস নেই তিনকড়ির। কেমন যেন মাথা ঘোরাচ্ছে। মাথার মধ্যে গানের কলি ঘুরে ঘুরে বাজছে। ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে।

কিসের ভালবাসা? কার ভালবাসা?

বেশ জোরে বাতাস বইছে। তারায় ভরা ঝলমলে বৈশাখের আকাশ, একফালি চাঁদও উঠেছে। মাথা ঘোরাটা কমেছে। পাড়া ছাড়িয়ে তিনকড়ি নদীর ঘাটে গিয়ে একটু বসলেন। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু একটা মিষ্টির দোকান খোলা রয়েছে। হরেন ঘোষের দোকান।

তিনকড়ি আজ আর রান্না করবেন না। বাসায় মুড়ি আছে, এক আনার কাঁচাগোল্লা কিনে নিলেন হরেনের দোকান থেকে।

বাসায় ফেরার পথে একটা ঘটনা ঘটলো। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে ওদিক থেকে কে যেন আসছিল। হঠাৎ তিনকড়িকে দেখেই বোধ হয় লোকটা পায়ে চলা পথ ছেড়ে বাঁশবনের আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেলো। লোকটার হাতে একটা বোঁচকা মত। কিন্তু লোকটার হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন চেনা-চেনা।

হয়তো কোনো ছিঁচকে চোর হবে।

ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে খুব একটা পাত্তা দিলেন না।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে খেয়াল হলো গুহবাড়ির সবাই এখনো ইলশা থেকে ফেরেনি। ফিরলে নদীর ঘাটে তিনি তাদের নৌকো থেকে নামতে দেখতেন। বোধ হয় ফিরতে আরো রাত হবে।

বাসার সামনে এসে তিনকড়ি দেখলেন তাঁর পায়ের শব্দ শুনে বাড়ির মধ্যে থেকে তরলা আলো হাতে বাইরের উঠোনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যার প্রদীপ অনেকক্ষণ আগে নিভে গেছে। তরলার হাতে একটা কেরোসিনের কুপি। চড়া বাতাসে যাতে আলোটা নিভে না যায়, তাই তরলা হাতের পাতা দিয়ে কুপিটাকে আড়াল করে রেখেছে।

কেরোসিনের কুপির এক ঝলক আলোয় তিনকড়ি তরলাকে দেখতে পেলেন। কালো, গোলগাল, স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্য চেহারা। নাকে নোলক, কানে কানপাশা, তাঁতের শাড়ি।

(চার) অতীতের তীর হতে

...ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে।...

কাঁচা টাকার মত একেকটা ঝকঝকে দিন যেন সদ্য টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। চারদিকে সবাই হাসিখুশি, কাছের লোক।

একেকটা দিন অত উজ্জ্বল নয়, কিছুটা নিষ্প্রভ। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা। চেনা লোককে কেমন অচেনা মনে হয়। অচেনা লোককে চেনা মনে হয়। ভুলে ভরা দিন।

এর পরেও এমন দিন আছে ঘষা পয়সার মত। অচল। কারো সঙ্গে কোনো লেনদেন, বিনিময় নেই। জগৎ সংসারের চাকা আটকিয়ে যায়। দিন গড়াতে চায় না।

সেই ময়মনসিংহের সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে বাবার মৃত্যুর পর নিজের গ্রামে ফিরে আসার পর, সেই কিশোর বয়েস থেকে এখন এই তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত, তিনকড়ি মনে মনে হিসেব করে দেখেছেন, হাজার সাতেক দিন তিনি পার হয়ে এসেছেন।

প্রত্যেক দিনই খিদে লেগেছে, ঘুম পেয়েছে। সব সময়ে যে ক্ষুধার অন্ন বা নিদ্রার বিছানা জুটেছে তাও নয়।

সূর্য উঠেছে। সূর্য ডুবেছে। দিন শেষ হয়ে রাত এসেছে। রাত শেষ হয়ে দিন এসেছে।

যতদিন মা-ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন, পিসিমা বেঁচে ছিলেন সে একরকম গেছে। তারপর সখিপুরের বাড়িতে কয়েক বছর একা একা।

প্রথম কয়েক বছর পাড়ার লোকজন দূরের আত্মীয়স্বজন খোঁজখবর

নিতো। কিন্তু কারোর কাছে কোনো সাহায্য নেওয়া তিনকড়ির ধাতে নেই।

মাঝে-মধ্যে পালাপার্বণে পদ্মাবতী-যমুনাবতী লোকজন পাঠিয়ে তিনকড়িকে ধরে নিয়ে যেতেন।

কখনো কখনো তিনকড়িও যেতেন। শোয়ার ঘরের পিছনে একটা বেলগাছ আছে। ছোট-ছোট ফল হয়। খুব মিষ্টি, এই বেল যমুনাবতীর খুব প্রিয়।

বেল পাকলে এক সঙ্গে পনেরো-বিশটা বেল নিয়ে তিনকড়ি দিদিদের শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসতেন।

পদ্মাবতী কমলাবতী দুজনেই টোপাকুল খুব ভালবাসে। সখিপুরের বাড়ির পিছনে টোপাকুল গাছের জঙ্গল। তিন চারটে নতুন-পুরনো গাছের ভিড়। শীতকালে গাছটা হলুদ হয়ে থাকে পাকা টোপা কুলে।

পদ্মাবতীদের তিন বোনেরই টোপাকুলে খুব লোভ। নুন-ঝালের গুঁড়ো দিয়ে কিংবা গুড়, কাঁচা লঙ্কা সরষের তেল দিয়ে মেখে কাঁচাই খেয়ে নেয় তারা। টক-অম্বল চাটনিও রাঁধে। কুল দিয়ে শীতের সরপুঁটি কিংবা খলসে মাছের টক। তার স্বাদই আলাদা।

প্রত্যেক বছর শীতকালে এক ধামা ভর্তি টোপাকুল দিয়ে আসে পদ্মাবতীদের। পদ্মাবতী ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রত্যেকবার কুল পাকলে এক জোড়া ইষ্টিকুটুম পাখি আসতো, সেগুলো এখনো আসে?'

তিনকড়ি হাসেন, বলেন, 'শেষ রাত থেকে চেঁচানো শুরু হয় 'ইষ্টিকুটুম আয়,' 'ইষ্টিকুটুম আয়'। এখন আর একজোড়া নয়, চারদিকের সব ইষ্টিকুটুম জেনে গেছে আমাদের কুলগাছের কথা। 'জোড়ায়-জোড়ায় আসছে'।

তারপর একটু থেমে নিয়ে বলেন, 'তোরা তো আসিস না। এদিকে সারা দিন হইচই চলছে, ইষ্টিকুটুম আসে, ইষ্টিকুটুম আসে।'

কথাটা সত্যি।

পদ্মাবতী-যমুনাবতীই শুধু নয়, ছোট বোন কমলাবতীও এই মির্জানগরের বাড়িতেই থাকে। এদের কারোরই সখিপুরে যাওয়া হয় না।

সখিপুর যে খুব দূরে বা অগম্য তা নয়। কিন্তু যাওয়া হয় না।

তিনকড়ির জামাইবাবুদের এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই, শূন্য বাড়িতে কি যাবে?

দিদিদের বরেরা যে খুব খারাপ বা কঠোর লোক তা নন, কিন্তু তাঁরা এই যুবক বয়সেই খুব বিষয়ী, বাস্তব বুদ্ধির লোক।

তা ছাড়া তিনকড়ির একটা নিজস্ব অসুবিধে আছে।

যমজ দেখলেই তিনকড়ির কেমন একটা অস্বস্তি হয়। দুই জামাইবাবু গৌর-নিতাই। এদের মধ্যে কে যে গৌর, কে যে নিতাই তিনকড়ি ঠাহর করতে পারেন না। দিদিরা যে কি করে তাঁদের বরদের আলাদা করে চিনতে পারেন, সেটা তিনকড়ির কাছে একটা সমস্যা।

জামাইবাবুরা লোক খারাপ না হলেও একটু নীরস প্রকৃতির। সব সময় তাঁদের মন পড়ে থাকে তেজারতি কারবারে।

তিনকড়ির সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা খুবই কম হয়। কদাচিত যা দুএকটা কখনো কখনো বা হয়েছে সে মোটেই তিনকড়ির বিষয় নয়। তেজারতি কারবারের ব্যাপার নিয়ে, একবার গৌর কী নিতাই, কে যেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের গ্রামের সাধু কর্মকারকে চেনো?

তিনকড়ি বললেন, 'তা চিনবো না কেন?'

এর পর জামাইবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন সাধু কর্মকার কেমন লোক, তার সহায়-সম্পত্তি কিরকম, টাকা ধার দিলে শোধ দেবে কি না, দিতে পারবে কি না।

বলা বাহুল্য, সঙ্গত কারণেই তিনকড়ি এঁদের এড়িয়ে চলেন।

তবু দিদিদের আগ্রহেই হোক বা সামাজিক দায়বোধেই হোক, জামাইবাবুরা তিনকড়ির একটি উপকার করলেন। তাঁরা কমলাবতী অর্থাৎ তিনকড়ির ছোড়দির বিয়ে ঠিক করে ফেললেন।

পাত্র বেশ ভাল। জামাইবাবুদের দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। বি এ পাস। কলকাতায় সওদাগরি অফিসে কেরানির কাজ করে। মাইনে বত্রিশ টাকা।

কমলাবতী তখন আঠারো পেরিয়েছে। সে সময়ের পক্ষে এটা খুব বেশি বয়েস। আর বেশি দেরি হলে বিয়ে হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো।

সেটা তিনকড়ির ম্যাট্রিকের বছর। চৈত্রমাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হলো। বৈশাখে বিয়ে।

বিয়ের খবর পেয়ে সপ্তাহখানেক আগে পিসতুতো দাদা সদানন্দ এলেন। সিরাজগঞ্জ থেকে। বদলি হয়ে সদানন্দ তখন ময়মনসিংহে কাজ করছেন।

মির্জানগরে কুটুমবাড়ি থেকে মামাতো বোনের বিয়ে হোক এটা সদানন্দ চান না। তিনকড়িকেও তিনি বোঝালেন।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। গত কয়েক বছরের অযত্নে বিনা মেরামতিতে এ বাড়ির খুবই ভগ্নদশা। উঠোনের বড় ঘরটা একদিকে হেলে গেছে। যে কোনো সময় মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। এই ঘরেই তিনকড়ি থাকছিলেন, কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্রহ্মহত্যা হয়ে যাবে এই কারণে রীতিমত জোর করে তিনকড়িকে এ ঘর থেকে বার করে। গত বছর কালবোশেখির পর থেকে উঠোনের অন্যপাশে ঠাকুরঘরে থাকেন। এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত শক্ত, আগে সদানন্দদাকে নিয়ে পিসি এ ঘরে থাকতো।

পুরনো বড় ঘরটার জন্যে খুব মায়া হয় তিনকড়ির। বাঁশের ঝাঁপ দেয়া জানলাটা তুলে দিলে হু হু করে হাওয়া আসতো। কোনো কোনো স্বচ্ছল রাতে ময়লা বিছানার শিয়রে শক্ত পুঁটুলির মত দলাপাকানো বালিশে জ্যোৎস্না এসে পড়তো। বালিসে মাথা রাখলেই চোখের ওপরে চাঁদ।

জানলার নিচে একটা গোঁড়া লেবুর গাছ আছে। তার পিছনে এক জোড়া সজনে গাছ। লেবু ফুলের তীব্র গন্ধ, সজনে ফুলের নরম সৌরভ। জানলা দিয়ে, জানলা বন্ধ করে দিলেও ছেঁচা বাঁশের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে গন্ধ ভেসে আসে।

কিন্তু এই বড় ঘরটাই যে পড়ো-পড়ো। তা ছাড়া আগাছায় বুনো জঙ্গলে বাড়িটা ছেয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে কেমন পোড়ো বাড়ি মনে হয়। ইঁদারাটাও অনেক দিন পরিষ্কার করা হয়নি। তার মধ্যে শেওলার দাম, ব্যাঙের বাসা।

এ বাসায় তিনকড়ির মত আলাভোলা বালকের মাথা গোঁজার হয়তো জায়গা আছে। বাল্যস্মৃতি ঘেরা এ বাড়িতে সদানন্দও দু-চারদিন কাটাতে পারে কিন্তু এখানে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। যত কমই হোক, আত্মীয়-কুটুম পাড়া-প্রতিবেশী আসবে, বরযাত্রীরা আসবে। তাদের বসা থাকার জায়গা দিতে হবে।

সুতরাং সদানন্দ জোর করলেও কমলাবতীর বিয়ে মির্জানগরেই হলো। জামাইবাবুরা সম্বন্ধ করেছেন, উদ্যোগ আয়োজন করেছেন। তাঁদের জনবল, অর্থবল আছে।

শুভদিনে, শুভলগ্নে কমলাবতীর বিয়ে হয়ে গেলো। সতেরো বছর বয়েসেই তিনকড়ি অনুভব করলেন তিনি দায়মুক্ত হলেন। এখন ঝাড়া হাত-পা।

বৈশাখে কমলাবতীর বিয়ে হলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরোলো।

আগেই সদানন্দ বলে গিয়েছিলেন, ম্যাট্রিক পাসের খবর পেলেই এ বাড়ি তালাবন্ধ করে ময়মনসিংহে আমার কাছে চলে আসবি।

এখান থেকে জেলাসদর ময়মনসিংহে যাওয়া খুব সোজা। গ্রাম পেরিয়ে সাপাইলের মোড়ে গেলেই বাস স্ট্যান্ড। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসে। মধুপুরের গড়ের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মুক্তাগাছার মহারাজাদের প্রাসাদ পেরিয়ে সাড়ে তিন বড় জোর চার ঘণ্টায় বাস পৌঁছে যায়।

পরীক্ষার ফল বেরোনোর ঠিক পরদিন সকালবেলা মির্জানগরের বাড়িতে গিয়ে দিদি-জামাইবাবুদের প্রণাম করে, সেখানেই দুপুরবেলা খেয়ে বিকেলে বাস স্ট্যান্ড থেকে তিনকড়ি বাস ধরলেন। হাতে পুরনো জামা-কাপড়ের একটা বোঁচকা। সখিপুরের ভাঙা বাড়ির চাবি বড়দির হাতে দিয়ে এসেছেন।

তিনকড়ি যখন দিদিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন দিদিরা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তিনকড়ি তাঁদের একমাত্র ভাই, শুধু তাই নয়, তিনকড়ির সখিপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে তাঁদের শৈশব, কৈশোরের অনেক সুখ-দুঃখ স্মৃতি থেকে তাঁরা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

তিনকড়ির চোখেও বুঝি এক বিন্দু জল দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সামনে বিশাল জীবন, তিনকড়িকে শক্ত হতে হবে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ শহরের বাস স্ট্যান্ডে এসে নামলেন তিনকড়ি।

তাঁর পুরনো চেনা শহর। অন্ধকার গ্রামাঞ্চল থেকে এসে বিদ্যুতের

আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে। ছোটবেলায় সেই সিটি কলেজিয়েট স্কুলের দিনগুলিতে যখন তিনকড়ি বাবার সঙ্গে এ শহরে থাকতেন, তখনই বিদ্যুৎ এসে গিয়েছিলো শহরে কিন্তু এত আলোর বাহার ছিল না।

বাস স্ট্যান্ড একদম রেল স্টেশনের সামনে। এখান থেকে সদানন্দদার আস্তানা দূর নয়। রেল স্টেশনের ওপারে সদানন্দদা আরো কয়েকজনের সঙ্গে একটা বড় টিনের চালায় মেস করে থাকে।

টিনের বেড়া, টিনের ছাদ, তার নিচে কাঠের পাটাতন, সিমেন্টের মেজে। কুড়ি হাত পাশে, কুড়ি হাত লম্বা বিশাল চৌকো ঘর একটা।

ঘরের মধ্যে গোটা দশ তক্তাপোষ। ঘরের পিছনের দেয়ালে একটা গজারি কাঠের খুঁটিতে পেরেক পোতা। তাতে একটা নিভুনিভু লণ্ঠন জ্বলছে।

প্রায় বিনা চেষ্টাতেই চেনা বাড়ির মত তিনকড়ি বাড়িটায় পৌঁছে গেলেন।

আজ সদানন্দ সন্ধ্যাবেলা কোথাও বেরোননি। কালকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কমলাবতীর বিয়ের পর সখিপুর থেকে আসার সময় তিনি তিনকড়ির রোলনম্বর টুকে এনেছিলেন।

সিটি কলেজিয়েট স্কুলে পরীক্ষার ছাপানো রেজাল্ট এসেছে। সেখানে গিয়ে সদানন্দ দেখে এসেছেন, ভালোভাবে না করলেও তিনকড়ি পাস করেছে।

অনুমানে হিসেব করে সদানন্দ ধরে নিয়েছিলেন আজ তিনকড়ি আসতে পারে। আজই বাজারে গিয়ে তার জন্যে তিন টাকা দিয়ে একটা কাঠের তক্তাপোষ কিনে এনেছেন।

অল্প আলো হলেও তিনকড়ি ঢুকতেই সদানন্দ বুঝতে পারলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে তিনকড়ির হাত থেকে বোঁচকাটা নিয়ে নতুন তক্তপোষটার ওপরে নামিয়ে বললেন, 'এটা তোর জায়গা। একটা বিছানা আনিসনি! কাল বাজারে গিয়ে একটা চাদর, বালিশ আর মশারি কিনতে হবে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দে।'

তিনকড়ির কাছে বাবার মৃত্যুর পরে পোস্টাফিসে জমা দেয়া অবশিষ্ট একশো দশ টাকা ছিলো। টাকাটা কমলাবতীর বিয়ের সময় তিনকড়ি

তুলেছিলেন। কিন্তু জামাইবাবুরা তাঁকে প্রায় কিছুই খরচ করতে দেননি।

এর ওপরেও আজকে আসার সময় পদ্মাবতী তাঁকে জোর করে দুটো দশ টাকার নোট দিয়েছেন। খরচ খরচা বাদ দিয়ে এখনো তাঁর কাছে প্রায় সোয়া শো টাকা রয়েছে।

এর থেকে একশো টাকা পিসতুতো দাদার হাতে দিলেন তিনকড়ি।

সদানন্দ আপত্তি করলেন না। টাকাটা ঘরের এক পাশে রাখা একটা স্টিল ট্রাঙ্কে তুলে রাখলেন। ট্রাঙ্কটা দেখে তিনকড়ি চিনতে পারলেন এটা পিসিমার পুরনো ট্রাঙ্ক। চলে আসার সময় সদানন্দদা নিয়ে এসেছিলেন।

পিসির আমলে ট্রাঙ্কটার ওপরে একটা পশমের আসন বিছানো থাকতো। সেই আসনে বাঁকানো শিং একটা বলগা হরিণের ছবি ছিলো। ছোটবেলায় সখিপুরের বাড়িতে পিসির ঘরে গেলে বলগা হরিণের ঐ সিংয়ের ওপরে তিনকড়ি বসতেন। এ ব্যাপারটা অবধারিত ছিল।

সদানন্দ টাকাটা ট্রাঙ্কে রেখে দিয়ে বললেন, 'এখন আমার কাছে রেখে দিচ্ছি, কাল ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবো। তোর যখন দরকার পড়বে তখন নিবি।'

মেসবাড়িটার স্থানীয় নাম ছিলো মহাজন বাড়ির মেস। একদা এই বাড়িটা কোনো মহাজনী কারবারির গদি ছিলো।

বড়ঘরটার পাশেই একটা টিনের চালায় রান্নাঘর। উঠোনে টিউবওয়েল। দুটো কাঁঠাল একটা আম গাছ। একপাশে একটা অযত্নের ফুলবাগান, তুলসীতলা।

মেসবাড়িতে একজন রান্নার লোক, একজন ফাইফরমাস খাটার লোক।

পরদিন সকালে সদানন্দ তিনকড়িকে বললেন, 'চল তোকে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি করে দিয়ে আসি।'

তিনকড়ি অবাক হয়ে বললেন, 'কলেজে পড়ার জন্যে পয়সা কোথায়? একটা কাজ-টাজ পাওয়া যাবে না?'

সদানন্দ বললেন, 'কাজ তো খুঁজতে হবে। এখন কলেজে ঢুকে যা। খরচা আমি চালাতে পারবো, তুই না হয় পরে উপার্জন করে শোধ করে দিবি।'

আনন্দমোহন কলেজে তিনকড়ি চার বছর পড়েছিলেন। তবে বি এ টা পাস করতে পারেননি। ইতিহাসে ফেল করেছিলেন। তখন কম্পার্টমেন্টাল, ব্যাক এসব ছিলো না। তিনকড়ির আর বি এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

এর মধ্যে সদানন্দ একবার টাঙ্গাইল, একবার জামালপুরে বদলি হলেন।

বি এ ফেল করার পর প্রায় দুবছর বেকার ছিলেন তিনকড়ি, তখনো সদানন্দ তাঁকে টেনেছেন। অবশেষে মির্জানগরের জামাইবাবুদের সুবাদেই একটা কাজ পাওয়া গেলো। এ শহরের দায়রা আদালতের সবচেয়ে নামকরা উকিলদের একজন গোলাপ চৌধুরীর সেরেস্তায় মুহুরির কাজ পেলেন তিনকড়ি।

গোপালবাবু প্রখর বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান ভদ্রলোক। প্রচুর বাজার করতে, খাওয়া দাওয়া, হইচই করতে ভালোবাসেন। নিজের জন্যে, লোকজনের জন্যে খরচ করেন।

তিনকড়িকে গোলাপবাবুর খুব পছন্দ। গোলাপবাবু সাহিত্যরসিক মানুষ। পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের সাহিত্য সম্পাদক। তিনি দেখেছেন তিনকড়ি ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে উপন্যাস নিয়ে পড়ে।

১৯৪৪ সালের শেষ দিক। যুদ্ধ ধীরে ধীরে ইংরেজদের পক্ষে যাচ্ছে। কংগ্রেসের বিপ্লবের ডাক স্তিমিত হয়ে এসেছে। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন। কম্যুনিস্টরা ইংরেজের পক্ষে চলে গেছে। খুব গোলমেলে সময়।

তিনকড়ি তখন মহাজনী মেস ছেড়ে চলে এসেছেন। গোলাপবাবুর বড় দোতলা বাড়ি। পিছনের দিকে একটা ঘরে তাঁর ঠাঁই হয়েছে। সদানন্দ তখন জামালপুরে। মাঝে মধ্যে ময়মনসিংহ এলে তিনকড়ির কাছেই ওঠেন। সদানন্দ এলে তাঁর কাছে কখনো কেউ কেউ আসেন। খুব সন্ত্রস্ত ভাবে, গোপনে। এঁরা সব প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবী।

তিনকড়ি ভয় পান, সদানন্দদার সরকারি চাকরিটা না যায়। সদানন্দ বলেন, জামালপুরে তো কেউ কিছু জানে না। আর এখানে গোলাপ চৌধুরী সরকারপক্ষের উকিল। তাঁর বাড়িতে পুলিশ নজর রাখে না।'

সে যা হোক, গোলাপবাবু মধ্যে মধ্যে তিনকড়ির সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। একদিন অসতর্কভাবে তিনকড়িকে গোলাপবাবু তাঁর কি কি বই পছন্দ এবং তিনি নিজেও যে বই লিখতে চান সেটা বলেন। তিনকড়ির পছন্দের বইয়ের নাম শুনে গোলাপবাবু বলেন, "পথের দাবী". "পথের পাঁচালি" তুমি কি উপন্যাস লিখবে, "পথের কাঁটা"?

প্রশ্নটা করেই নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে ফেলেন গোলাপবাবু। তিনকড়ি একটু বিব্রত বোধ করেন।

পিতৃমাতৃহীন এই অনাথ যুবকটির ওপরে গোলাপবাবু একটু স্নেহশীল হয়ে পড়েছেন। পরিষ্কার সরল প্রকৃতির ছেলে। কোনো নেশা করে না। উপন্যাস লেখার স্বপ্ন দেখে। এদিকে গোলাপবাবু তিনকড়ির ঘরে সদানন্দদের কাছে কারা আসে সেটা জানেন, হয়তো পুলিশই জানিয়েছে। যাঁদের আনাগোনা, ঐ নামকাটা বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনকড়ি মেলামেশা করেন এটা গোলাপবাবু ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু তিনি তিনকড়ির অভিভাবক নন। কি বলবেন?

তবু এরই মধ্যে কথায় কথায় আকার ইঙ্গিতে গোলাপবাবু তিনকড়িকে বলেছেন, 'কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ো না। আমি তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দেবো।'

সরকারের কোনো কোনো দপ্তরের সঙ্গে ডাক বিভাগও গোলাপবাবুর মক্কেল। ডাক বিভাগের এ জেলার মামলা-মোকদ্দমা তিনিই দেখেন। ডাক বিভাগে ছুটছাট খুচরো কাজ খালি হয়। সেটা গোলাপবাবুর মাথায় আছে।

চরম ঘটনা ঘটলো একদিন। বিপ্লবী সুশীল পালের একটা রিভলভার ছিল সদানন্দের কাছে। সুশীল গ্রেপ্তার হওয়ার খবর আসার পর সদানন্দ বেরিয়ে যান। যাওয়ার সময় ছোট একটা পুঁটুলি তিনকড়িকে দিয়ে বলে যান। 'এটা লুকিয়ে ফেলিস।' তিনকড়ি খুলে দেখেন সেটা একটা রিভলভার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটাকে পাশের জমিদার বাড়ির রাস্তা সংলগ্ন পুকুরে ফেলার জন্য ফাঁকা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তিনকড়ি বারান্দায় ওদিক দিয়ে ঘুরে আসছিলেন। মধ্যে একটা থাম, থামের আড়াল থেকে দেখতে পাননি। তা হলে ফিরে যেতেন।

হঠাৎ গোলাপ মুখোপাধ্যায় একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। গোলাপবাবু ওকালতি করে খান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। তিনকড়ির হাতের মোড়কটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি?'

তিনকড়ি হাতের জিনিসটা আড়াল করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। চটের ভাঁজ খুলতে রিভলভারটা বেরোলো। গোলাপবাবু বললেন, 'ওটা আমাকে দাও।'

নিঃশব্দে তিনকড়ি রিভলভারটা গোলাপবাবুর হাতে তুলে দিলেন। গোলাপবাবু এটা নিয়ে এখন কি করবেন কে জানে।

তবে গোলাপবাবু বললেন, 'তোমাকে আর এখানে থাকতে হবে না। আমি তোমার বন্দোবস্ত করেছি।'

একটা ডাক-ডাকাতির বিপ্লবী মামলায় মকদমপুরের হাজি বাড়ির জামাতা এখানকার গেজেটেড পোস্টমাস্টার পাবনার সিরাজুল হক গোলাপবাবুর কাছে প্রায়ই আসেন।

তিনিই তিনকড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন।

(পাঁচ) পাখির পালক

নদী থেকে উঠে আসে পথ,
নাকি পথ নেমে যায় নদীর ভিতরে?
...তবুও কেন যে মনে মনে
থেকে যায় কাঁচা রাস্তা, ভাঙা পাড়
অমল কাদায়
পথ ও নদীর মধ্যে পড়ে থাকে
পাখির পালক।

হাজি বাড়ির জামাই বন্দোবস্ত করে দিলেন এই নিঝুমপুর। ব্রাঞ্চ পোস্টাফিসের টেম্পরারি সাব-পোস্ট মাস্টারের চাকরি।

প্রথম প্রথম ময়মনসিংহ থেকে এসে নিঝুমপুরে মোটেই মন বসেনি তিনকড়ির। জায়গাটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা, ছাড়া-ছাড়া।

নদীটা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই একটা বড় চর উঠেছে। সেখানে ধানচাষ করা হয়েছে। সবুজে সবুজ হয়ে আছে চরটা। বর্ষায় নিশ্চয় ডুবে যাবে। তার আগে অবশ্য ধানকাটা হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা বোধহয় খুব নির্বিবাদ হবে না।

চরের জমিটা কাদের? কারা ধান চাষ করেছে কারা ধান কাটবে—এসব নিয়ে আশেপাশের গ্রামের মধ্যে বিবাদ আছে সেটা পোস্টাফিসের ঘরে বসেই তিনকড়ি টের পান।

কিন্তু তিনি বাইরের লোক। এসব হাঙ্গামার মধ্যে জড়াতে যাবেন কেন। দুয়েক দিন পরেশ ডাক্তারের ঘরে উত্তেজিত সালিশি বসেছে, হৈচৈ চিৎকার তিনকড়ি শুনেছেন।

যখন স্টিমার এসে ঘাটে লাগে ছেড়ে যায়, যখন স্ট্যান্ডে এসে বাস

দাঁড়ায় তখনো বেশ হই হট্টগোল হয়।

এছাড়া বাকি সময় চারদিক একদম ধূধূ করে। নদীর ধার দিযে বাস রাস্তার নাবালে একপাল গরু চরে বেড়ায। মাঝে মধ্যে চিলের চিৎকার শোনা যায়। প্রায় সারা দিন চিলগুলো নদীর ওপরের আকাশে ঘুবে বেড়ায়। মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তার শব্দ কমই শোনা যায়।

নদীর ওপারেও ধানক্ষেত, তার ওপারে বাঁশবন আর নারকেল সুপারির সারির নিচে অস্পষ্ট ছোট ছোট গ্রাম। সেখানকার মানুষজন কখনো কখনো ডিঙি নৌকোয়, কখনো খেয়া নৌকোয় এপারে আসে। স্টিমারঘাট এসব ছোট নৌকোর পক্ষে নিরাপদ নয়। নদীর বাঁকের দিকটায় বড় বড় বাঁশের খুঁটি পোতা, সেই খুঁটিতে জেলেরা বেড়াজাল আটকিয়ে দিয়েছে। নৌকোগুলো জালের এপাশের স্নান করার ঘাটের কাছে এসে থামে। এই ঘাট থেকে কাঁচা রাস্তা উঠে নিঝুমপুরের ভিতরে চলে গেছে।

এই জায়গায় একটা শতাব্দী প্রাচীন বিশাল গাছ রয়েছে। গাছটা বট, অশত্থ কিংবা পাকুড় নয়। এমনকি শিমুল বা কাঠবাদামও নয়। ছোট ছোট তিতকুটে ফল হয় গরমের দিনে, তার আগে গুড়ের দানার মত লালচে ঝির ঝিরে ফুল হয়, শক্ত, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

মধ্যরাতে এমন কি কোনো কোনো নিবিড়, গভীর মধ্যাহ্ন বেলায় হঠাৎই এই অবাস্তব প্রাচীন বিদেশি গাছের পাতায়-পাতায় ডালে ডালে কিরকম একটা ঝুম-ঝুম শব্দ হয়।

কোনো কোনো দুপুরবেলায় তিনকড়ি তাঁর ডাকঘরে বসে এই শব্দ শুনেছেন। প্রথম দিকে যেমন গুরুত্ব দেননি, ভাল করে শুনতেও পাননি। আজ আবার শব্দটা হলো। আজ শব্দটা বেশ স্পষ্ট। পরেশ ডাক্তার হঠাৎ রোগী দেখা থামিয়ে ডাক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

তিনকড়ি বলেন, 'একটু আগে কিসের একটা শব্দ হলো। ঝড়ের সময় এরকম শব্দ হয়। কিন্তু ঝড় কোথায়?

পরেশ ডাক্তার বলেন, 'আপনি নতুন লোক আপনি জানেন না কিছু। হাতটা খালি হলে আমি আপনাকে এসে বলছি।' পরেশ ডাক্তাব তাড়াতাড়ি রোগীবিদায় করতে চলে গেলেন।

নদীর বালুচরে, বড় বড় পানিঘাসের শীষে দুপুর ঝিমঝিম করছে। এখন বাস নেই। স্টিমারও নেই। ডাকঘরে একাই বসে আছেন তিনকড়ি।

একটু পরে রোগী দেখা এখনকার মত শেষ করে পরেশ ডাক্তার ঐ ঝুম-ঝুম শব্দটা নিয়ে একটা উদ্ভট গল্প শোনাতে আসবেন।

এমনিতে সব ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু তিনকড়ি একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। সেই পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা গুহবাড়ির লোকেরা ইলশাগ্রামে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন। সেদিন অবশ্য ঘরে ফিরে শূন্য বাড়িতে তরলার দিক থেকে কোনো বিপদ আসেনি।

তবে তরলা বেশ কয়েকবার ছোটখাটভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। উঠোন দিয়ে বারবার বোধ হয় বিনা কারণে, যাতায়াত করেছে, যদিও সাহস করে বাইরের দিকে আসেনি। কেরোসিনের কুপির চলমান আলো ভিতর বাড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ছায়া বাইরে এসে পড়েছে। তরলার নরম পায়ের শব্দও পাওয়া গেছে। একবার ডোবার ঘাটে গিয়ে 'আতু-আতু' করে ডেকে এ পাড়ার যত কুকুরকে ভাত দিয়েছে।

একটা জিনিস টের পেয়েছেন তিনকড়ি। তরলার কুকুর-অন্ত প্রাণ। প্রতিদিন সকলের পাতের এঁটো, অবশিষ্ট ভাত-তরকারি তরলা কুকুরদের ডেকে খেতে দেয়। এবং সে সময় যথারীতি কুকুরদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই বাধে। সে লড়াই তরলাই থামায়। তিনকড়ি বুঝতে পারেন অতি পাজি কুকুরও তরলাকে মান্য করে। গায়ের রঙ এবং বয়েস অনুযায়ী কুকুরগুলোর নাম লালু, কালু, জংলা, সফেদা, বড় লালু, ছোট কালু ইত্যাদি। তিনকড়ি তাঁর ঘরে বসে ডোবার ধারে তরলার কুকুর শাসন করার চেঁচামেচি শুনেছেন, 'এই ছোট কালু, এই জংলা'। কুকুরেরা তরলার শাসন মান্য করেছে।

শুধু কুকুর নয়, গুহবাড়িতে অনেকগুলো পাঁতিহাস আছে। সেগুলো সারাদিন ভিতরের ডোবায় চরে বেড়ায়। ডোবার ধারে বড় বড় গাছ আর ঝোপজঙ্গলের ভিতরে বিকেল খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। শেয়ালের ভয়ে হাঁসগুলো পায়ে পায়ে উঠে আসে জল থেকে। তখনও বাইরের উঠোনে লম্বা রোদ।

একদিন লাস্ট বাস না থাকায়, সেদিন বোধহয় ছিলো পয়লা বৈশাখ, বিকেলের দিকে অনেক বাসই চলেনি, ডাকঘরও সেদিন ছুটি, তিনকড়ি বাসায় ফিরে এসেছিলেন, বিকেল-বিকেল রোদ থাকতে।

তিনকড়ি বাড়িতে চলে আসার অনেক আগে থেকে উঁচু রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ঘরের সামনের উঠোনে সূর্যাস্তের সোনালি আলোয় লালপাড় জলচুড়ি শাজাদপুরী শাড়ির ঘোমটা মাথায় দেয়া এক যুবতী। সেই যুবতী, তার হাতে একটা বেতের ছোট ধামায় সোনালি ধান, সে হাত দিয়ে উঠোনে সেই ধান ছড়াচ্ছে, আর মুখে বলছে, 'চই-চই, চই-চই'। আর তার পায়ে পায়ে ঘুরছে একপাল রঙ-বেরঙের হাঁস।

সেদিন সহসা অসময়ে তিনকড়িকে আসতে দেখে তরলা এক ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিলো। পিছনে প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে হাঁসগুলো লাইন করে দল বেঁধে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো।

তিনকড়ি তরলার চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ ডাক ঘরের মধ্যে কেউ একজন আচমকা ঢুকতে তিনি সম্বিৎ পেয়ে ফিরে তাকালেন।

সেই সনাতন হরকরা।

তরলা নয়। এই লোকটা পরশুদিন রাতে তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলে ছিলো।

তিনকড়ির শোয়ার ঘরে দামি জিনিসপত্র কিছু নেই। টাকা-পয়সা সামান্য যা কিছু সেটা জামার পকেটেই থাকে। পুরনো জামাকাপড়, কিছু বইখাতা, বালিশ, মশারি এসব চুরি যায় না। তাই তিনকড়ি যখন ঘর থেকে বেরোন দরজায় শুধু শিকল তুলে দিয়ে যান। তালাটালা লাগাতে চান না।

সেদিন দত্তবাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে এবং তারপর নদীর তীর থেকে ফিরে ঘরে আলো জ্বালতে তিনকড়ি দেখলেন ডাকের থলি নেই।

ডাকের থলি মানে সনাতন হরকরা তার থলিটা পোস্টাফিসে রেখে গিয়েছিলো। গাঁজার আড্ডায় একবার ঢুকে গেলে সে কাণ্ডজ্ঞান সময় বোধ সব হারিয়ে ফেলে। সেই থলি পোস্টাফিসেই পড়ে থাকে। সনাতন স্টিমার ধরতে পারেনি।

খালি ডাক ঘরে রাতের বেলায় সরকারি ডাকের থলি না রেখে সেটা তিনকড়ি বাসায় নিয়ে এসেছিলেন।

থলিটা বিছানার এক পাশে মাথার বালিশ ঘেঁষে সাবধানে রেখেছিলেন। আলো জ্বেলে তিনকড়ি দেখতে পেলেন সেই থলিটা নেই।

প্রথমে খুবই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন তাঁর খেয়াল হলো—বাঁশবনের মধ্যে একটা লোক কি একটা বোঁচকা মতন হাতে, তাঁকে দেখে লুকিয়ে পড়েছিলো। তিনকড়ি বুঝতে পারলেন, সনাতন হরকরা গোপনে অন্ধকারে এসে তার থলিটা নিয়ে চলে গেছে।

বাঁশবনের মধ্যের রাস্তায় সনাতন হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়েছিলো। তারপর এ দুদিন নিরুদ্দেশ।

আজ খুব সাহস হয়েছে সনাতনের, বোধ হয় সকাল থেকে শ্মশান ঘাটে গাঁজা খেয়েছে।

ডাকঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে সে প্রায় সাষ্টাঙ্গে তিনকড়িকে প্রণাম করলো। এ পর্যন্ত সহ্য করা যায়। কিন্তু লোকটা আর ভূমিশয্যা থেকে ওঠে না।

এদিকে পরেশবাবু তাঁর শেষ রোগী বিদায় করে ঝুমঝুম গাছের কল্পকাহিনী শোনাতে এসেছেন। তিনি সনাতন হরকরাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন।

দেখা গেলো, সনাতনও পরেশবাবুকে 'বিলক্ষণ চেনে। সে পরেশবাবুকে দেখে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসলো।

পরেশবাবুর সামনেই তিনকড়ি সনাতনকে জেরা করলেন, সরাসরি প্রশ্ন, 'সে দিন রাতের বেলা ডাকব্যাগটা নিয়ে কোথায় চলে গেলি?'

সনাতন বললো, 'রাতের বেলায় ওপারে যাওয়ার একটা খালি নৌকো পেয়ে গেলাম। তাতেই চলে গেলাম।'

'কিন্তু আজকের ডাক?' তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকের ডাক আনিসনি।'

সনাতন বললো, 'আজকে এদিককার ডাক নিয়ে ফিরে গিয়ে কাল একবারে তিনদিনের ডাক নিয়ে আসবো।'

তিনকড়ি চটে গেলেন। কিন্তু প্রায় বিনা বেতনের গাঁজাখোর ডাক

হরকরাকে ধমকিয়ে লাভ নেই। এখনকার দিনে ডাক হরকরার কাজে লোক পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তা ছাড়া সনাতন বিশ্বাসী লোক। একথা মনে মনে ভাবতেই পরশুদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনা মনে পড়তে তিনকড়ি আপন মনে একটু হাসলেন। তারপর কৃত্রিম কোপান্বিত কণ্ঠে সনাতনকে বললেন, 'যা এবার ছেড়ে দিলুম। সদরে জানিয়ে দিলে জেল-ফাঁসি হয়ে যাবে।'

ছাড়া পেয়ে সনাতন গুটিগুটি বেরিয়ে যাচ্ছিল। তিনকড়ি তাঁকে বলে দিলেন, 'স্টিমার এলে ডাকব্যাগ নিয়ে যাস।'

সনাতন বেরিয়ে যেতে পরেশ ডাক্তার নিশ্চিত হলেন। তাঁর খেতে যাওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু ঝুমঝুম গল্পটা বলা হয়নি।

নিজেই হুঁকো ধরিয়ে পরেশবাবু ডাকঘরের ছোট টুলটার ওপরে জুত করে বসলেন।

তিনি কিছু বলার আগেই তিনকড়ি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ঐ ঝুম-ঝুম থেকেই কি আপনাদের এই জায়গাটার নাম নিঝুমপুর?'

মনে হলো, পরেশবাবু এ কথাটা আগে কখনো ভাবেননি। তিনি বললেন, 'এরকম কিছু শুনিনি। তবে তা হতেও পারে।'

এরপর পরেশবাবু এক আরব্য কাহিনী ফেঁদে বসলেন।

বহুকাল আগে, সে একশো বছরও হতে পারে, দু-চার শো বছরও হতে পারে এক প্রচণ্ড জলঝড়ের রাতে আরব দেশে থেকে এক দরবেশ এই গাছটি উড়িয়ে নিয়ে এখানে চলে আসেন। তখন নদী বারবার এদিক-ওদিকে বাঁক নিচ্ছিল। নদীর গতি বদলানোর তোড়ে গ্রাম জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। ঝুমঝুম গাছ আসার পর আর নদী দিক বদল করেনি। গাছটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে নদীর আক্রমণ যুগের পর যুগ ঠেকিয়ে যাচ্ছে।

পরেশ ডাক্তারের তাড়াতাড়ি আছে। ভাল করে ফেনিয়ে বলতে পারলেন না। শুধু বলে গেলেন, 'গাছটার নিচে একদিন যাবেন। দেখবেন কেমন বুক ছম ছম করে। গাছটায় কতরকম অজানা অচেনা পাখি আছে, সেগুলো মোটেই এদিকের নয়। গাছটায় একরকমের, কাঠবেড়ালি আছে, সেগুলো ডোরাকাটা নয় কুচকুচে কালো।'

যাওয়ার মুখে পরেশবাবুকে তিনকড়ি প্রশ্ন করলেন, 'ঐ ঝুম ঝুম শব্দটা কেন হয়?'

পরেশবাবু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'সেটা কেউ জানে না। কোনো অলৌকিক ব্যাপার হবে। এ সেই দরবেশের কেরামতি।'

পরেশ ডাক্তার মধ্যাহ্নভোজন করতে বাড়ি চলে গেলেন।

এদিকটা এখন একদম ফাঁকা। ওপারের ভূষার চর থেকে একটু আগে এক ঝাঁক বক উড়ে এসেছিলো। সেগুলোও ফিরে চলে গেছে। স্টিমার ঘাটের মিষ্টির দোকানগুলো ঝিমোচ্ছে। গোটা কয়েক লোমওঠা কুকুর প্রায় সর্বদাই পরস্পর মারামারি করে এখন মিষ্টির দোকানের ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অনেক গাঙশালিক আছে এ দিকটায়, কিন্তু দুপুরের এই সময়ে সেগুলো যে কোথায় যায়।

এরই মধ্যে খুটখুট করে এই রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে প্রায় এক ক্রোশ দূরের কাজীপাড়া গ্রাম থেকে এক বুড়ো এলো। তার হাতে একটা পোস্ট কার্ড। সিলমোহর দেখে তিনকড়ি বুঝতে পারলেন কালকের ডাকেই এসেছিলো। কাজীপাড়ার লোক কাল বিকালে অন্য সব চিঠি সঙ্গে নিয়ে গেছে।

বুড়ো পোস্ট কার্ডটা তিনকড়িকে দিয়ে বললো, 'মাস্টারমশায়, কি লিখেছে পড়ে দিন না'।

চিঠিটা ঢাকা থেকে বুড়োর জামাই লিখেছে। বুড়োর নাতনির বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্র ভালো, কলকাতার আরফান খান কোম্পানির কাগজের দোকানে কাজ করে। সামনের মাসের মাঝামাঝি বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।

চিঠিটা পড়ে বুড়োকে তিনকড়ি শোনালেন। বুড়ো শুনে খুব আশ্বস্ত হলো। বললো, 'সবাই তাই বললো বটে। তবু ভাবলাম চিঠিটা যখন আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। আপনার কাছে যাচাই করে নিয়ে যাই।'

সালাম জানিয়ে বুড়ো চলে গেলো। যাওয়ার আগে নীল পিরানের পকেট থেকে দুটো কাগজিলেবু তিনকড়ির হাতে দিয়ে গেলো। চিঠি পড়ে দেয়ার পারিশ্রমিক।

লেবু দুটো পেয়ে খুব খুশি হলেন তিনকড়ি। হাতের কাছে রাখা

কাগজকাটা ছুরির ডগাটা দিয়ে একটা লেবুর খোসা একটু কেটে গন্ধটা একটু শুঁকলেন। বহুদূর কালের বহুদূর জগতের হারিয়ে যাওয়া অবলুপ্ত অরণ্যের ঘ্রাণ লেবুর গন্ধে মিশে থাকে।

আজ দুপুরবেলায় মিষ্টির দোকান থেকে দই কিনলেন তিনকড়ি। একটা লেবু নিংড়ে রসটুকু দইয়ে দিয়ে মাটির কলসী থেকে একটু জল ঢেলে চমৎকার এক ঘটি ঘোল হয়ে গেলো।

ছোটখাট একটা তামার ঘটি। ঠাকুমার ঘটি ছিল এটা। সখিপুরের বাসা ছাড়ার পর থেকে ঘটিটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। কয়েক চুমুকে ঘোলটুকু নিঃশেষ করে তাঁর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলো।

এখনো গ্রীষ্মের সূর্য নদীর ওপরে মধ্য আকাশে। পশ্চিম দিকে হেলে নামতে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ততক্ষণে পরেশডাক্তার ভোজন, বিশ্রাম করে ফিরে আসবেন।

মধ্যে একটা বাস জেলাসদর থেকে, দুটো বাস কাছারি টাউন থেকে আসবে। স্টিমারের সময় নয়, বিশেষ লোকজন নামা ওঠা নেই। বাসের টাইমটা লিখে ছেড়ে দিলেই হলো।

এই হলো সময়।

তিনকড়ি সন্তর্পণে উঠে গিয়ে ডাক বিভাগের কালো স্টিল ট্রাঙ্ক খুলে খেরোর খাতা বার করে আনেন।

ময়মনসিংহ থেকে আসার সময় সাড়ে চার আনা দিয়ে স্টেশন রোডের সুলেমান দপ্তরীর দোকান থেকে কিনে এনেছিলেন।

এই খাতাটাই তাঁর স্বপ্ন।

খাতাটার প্রথম পাতায় লাল-নীল পেনশিলে আঁকিবুকি করে লিখেছেন :

তিনকড়ি সান্যাল

প্রণীত

নিঝুম, নিঝুমপুর

দুপুরের ঠিক এই রকম সময়ে নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, নিঝুম নদীতীরের এই ভাঙা ঘরের ছোট পোস্ট অফিসে বসে তিনকড়ি বুঝতে পারেন, এই জায়গাটার নাম কেন নিঝুমপুর। প্রথম প্রথম ভাবতেন গ্রামের এরকম

আশ্চর্য নাম কে রেখেছে। এখন বোঝেন, কেউ এ নাম রাখেনি, এমনি-এমনি লোকমুখে এই নাম রচিত হয়েছে।

খেরোর খাতার মলাটের পৃষ্ঠাটি উলটিয়ে তিনকড়ি একটু ইতস্তত করেন।

পরপর তিনচার বার পংক্তি লিখে কেটে দিয়েছেন।

প্রথমে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির সাধু ভাষায় লিখেছিলেন :

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়—ইহারই মধ্যে এই একটি নদীতীরের সবুজ বনে ঘেরা গ্রামের জীবন ঐ নদীর জলের মতই প্রবাহিত হইতেছে।

এর পরের অনুছেদে অবশ্য আরও জটিল। সেখানে কাহিনী শুরু হয়েছে গভীর রাতে নদীর ধারের এক ডাকঘরে। ম্যাজিস্ট্রেটের লঞ্চে ডাকাতি করে বিপ্লবীরা বন্দুক, রাইফেল সরকারি কাগজপত্র রেখে যাচ্ছে। মাস্টারমশায় বলছেন, 'কুছ পরোয়া নেই।'

এরকম আরও অনুচ্ছেদ রয়েছে। সবগুলো কেটে দিয়েছেন তিনকড়ি। তিনি পণ্ডিতপাড়া লাইব্রেরির খারাপ ভালো সব বই গোগ্রাসে গিলেছেন। তিনি জানেন, কোন্ লেখা পড়া যায়, কোন্ লেখা পড়া যায় না।

তিনকড়ি আজ খেরোর খাতায় প্রথম পাতার নিচে ফাঁকা জায়গায় লিখলেন :

তরলা কি চায়? তরলা কি জানে? অন্য কেউ কি জানে?...

একটু পরে নামটাকে তরলা কেটে সরলা করলেন।

এইরকম বানানো কথা লিখতে একদম ইচ্ছে করছিলো না তিনকড়ির। সামনের দিকে তাকিয়ে পরের পংক্তি খুঁজছিলেন। সেই সময় তাঁর চোখে পড়লো, গ্রামের ভিতর থেকে যে পথটা সামনের দিকে নদীর পারে এসেছে, সেখানে একটা ছোটখাট ভিড়।

(ছয়) কে যেন রেশম

অন্ধকারে কাঁপা গলা
যতদূর যেতে পারে তার থেকে কিছু
বেশি দূরে
নরম বালিতে মাথা রেখে
নিচে হাতের বালিশ
রেশম, রেশম কেউ শুয়ে আছে।

এই ভর দুপুরবেলায় ওখানে কিসের ভিড়। তাও মনে হচ্ছে মেয়েদের ভিড়ই বেশি।

নদী থেকে পথটা গ্রামে সরাসরি গেছে পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে। এ দিকের মুখটায় কয়েকটা গাব গাছ। কামরাঙা গাছ একটা, বেশ বড় আর পুরনো। মহিলাদের জটলাটা এই গাছগুলোর ছায়ার নিচে।

এই ভীষণ গরমেও এখানে একটু আরাম আছে। যদিও দুপুর সদ্য পেরিয়েছে, সূর্য এখনো প্রায় মধ্য আকাশে। এ জায়গায় এই গাব আর কামরাঙা গাছের ছায়া এখনো বিস্তৃত হতে দেরি আছে তবে খুব ঘন ছায়া। নদীর বুক থেকে একটা ঝিরঝিরে বাতাস উঠে আসছে গাছতলায়।

কৌতূহলবশত, খেরো খাতা বন্ধ করে লেখা থামিয়ে গাছতলার ভিড়টার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এগোলেন তিনকড়ি।

একটু এগোতেই বুঝতে পারলেন জটলার প্রায় সকলেই মহিলা, দুয়েকটি শিশু অবশ্য আছে।

ব্যাপাবটা আর কিছু নয়, শাঁখারিদের নৌকো ঘাটে এসেছে। ঢাকা থেকে বেদে-বেদেনিদের আর শাঁখারিদের নৌকো সওদা নিয়ে নদীপথে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোনো গ্রামের ঘাটে এসে বিক্রিবাট্টা বুঝে

দু-চার দিন থাকে। নৌকোতেই খাওয়া দাওয়া বসবাস, স্বামীস্ত্রী শিশুসহ সকলের।

জল এদের ঘরবাড়ি। জল এদের বাসা। এদের শিশুগুলি জলের পোকা। ময়মনসিংহে গোলাপবাবুর কাছারিঘরে এক বিলিতি চিত্রকরের আঁকা একটা বিখ্যাত ছবিব প্রিন্ট ছিল, ছবিটার নাম ওয়াটার বেবিস্।

শাঁখারিদের নৌকো থেকে কম করেও অন্তত তিনচারটি শিশু জলে ঝাঁপ দিয়ে লাফালাফি করছে, জল ছিটোচ্ছে, ডুব সাঁতার দিয়ে নৌকোর নিচ দিয়ে নৌকোর ওপাশে গিয়ে জলে ভেসে উঠছে। সেই ওয়াটার বেবিস্ ছবিটার কথা মনে পড়লো তিনকড়ির।

চড়া রোদের মধ্যেও নদীর হাওয়ায় খুব একটা অস্বস্তি লাগছিল না তাঁর। এর চেয়ে অনেক কষ্ট টিনের চালার নিচে বন্ধ ঘরে বসে থাকায়।

অবশ্য হাতে কাজ না থাকলে এমনকি উপন্যাস লেখার অভিরুচিও যখন থাকে না তিনকড়ি কখনো কখনো ভরদুপুরে নদীতে ভাসমান গাধাবোটটায় অর্থাৎ স্টিমারের প্ল্যাটফর্মটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন ঘাটে স্টিমার থাকে না গাধাবোটটা একদম ফাঁকা থাকে। নদীর জলে বড় বড় মাছ ঘাই মারে। বড় বড় শুশুক হুউস করে জলের ওপরে ভেসে উঠে আবার ডুবে যায়। বক-চিল সুযোগ-সুবিধে মত নদীর জলে ছোঁ দিয়ে ছোটখাট মাছ ধবে। এরই মধ্যে দূরে স্টিমারের ধোঁয়া দেখা দেয়, ধীরে ধীরে মহারাজগঞ্জ থেকে আসা স্টিমারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাধাবোট যাত্রীদের ব্যস্ততা আর নামাওঠার জন্যে ছেড়ে দিয়ে তিনকড়ি নিজের জায়গায় ফিরে আসেন।

আজ কিন্তু মহারাজগঞ্জের স্টিমারটা আসতে দেরি করছে। বিকেল যত গড়ায় সনাতন হরকরার গাঁজার আড্ডা উত্তুঙ্গে ওঠে। স্টিমার খুব দেরি করলে আজকেব ডাকও পড়ে থাকবে, সনাতন গাঁজার আড্ডা ছেড়ে যাবে না।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে তিনকড়ি গাবতলায় শাঁখারিদের নৌকোর ঘাটের মুখে চলে এসেছিলেন। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হলো, এখানে গ্রামের মেয়েরা শাঁখা কেনাকাটি করতে এসেছে, তিনি বিদেশি মানুষ, তাঁর পক্ষে এখানটায় আসা ঠিক হয়নি।

তিনকড়ি ঘুরে ডাকঘরের দিকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় ঘাটের থেকে একটি ঘোমটাপরা অল্পবয়সী বৌ নদীর ঢাল বেয়ে তাঁর সামনে তরতর করে উঠে এলো। বৌটির হাতে নতুন লাল শাঁখা। বোঝা যাচ্ছে সদ্য কেনা হয়েছে।

ঘোমটার আড়াল থেকে বৌটি জিজ্ঞাসা করলো, 'মাস্টারমশায়, এই রোদে নদীর ধারে ঘুরছেন। শরীর খারাপ হবে যে।'

বৌটির মুখটা, চেহারাটা আবছা চেনা। কিন্তু গলার স্বর শুনে তিনকড়ি বুঝতে পারলেন, তরলা। নদীর ঘাটে শাঁখা কিনতে এসেছে।

তার আগেই অবশ্য তরলা আত্মপরিচয় দিয়েছে, 'চিনতে পারছেন না? আমি গুহবাড়ির মেজবৌ তরলা। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আপনাকে আলো দেখাই।'

ইতিমধ্যে তরলার শাঁখা কেনার সঙ্গিনীরা ঘাট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছে। তাদের সঙ্গে তরলা বাড়ির দিকে চলে গেলো। যাওয়ার আগে একবার যেন মাথা ঘুরিয়ে তরলা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো, অন্তত তিনকড়ির তাই মনে হলো।

তিনকড়ি ডাকঘরে ফিরে এসে কাজের জায়গায় বসে দেখলেন পরেশ ডাক্তার খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে আসছেন।

খুব সম্ভব পরেশ ডাক্তার পথে তরলাদের দেখতে পেয়েছিলেন। ঘাটে এসে নিজের ডাক্তারখানায় না ঢুকে ডাকঘরের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে তিনকড়িকে প্রশ্ন করলেন, 'তরলাকুমারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে? আপনার মেজ মালকিন তরলা কুমারী?'

তিনকড়ি একটু বিরক্ত হলেন।

এটা কি জাতের প্রশ্ন? তা ছাড়া বাড়ির বৌ, তাকে তরলাকুমারী বলা কিরকম খারাপ শোনায়।

পরেশ ডাক্তারের কথাবার্তায় ধরন-ধারণ সবসময় তিনকড়ির ভাল লাগে না। তাঁর রুচিতে আঘাত লাগে।

ডাক্তারের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কেও তিনকড়ির মনে সন্দেহ আছে।

কথা নেই, বার্তা নেই দিন সাতেক আগে এক সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ পরেশ ডাক্তার প্রস্তাব করলেন, 'আজ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে।

চলুন আপনাকে নিয়ে একবার নটিবাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

নটিবাড়ি কোনো গ্রাম বা চরের নাম নয়। এ অঞ্চলে বেশ্যাপাড়াকে নটিবাড়ি বলে। নদীর ওপারে হাটখোলা, প্রত্যেক রবিবারে হাট বসে। সেই হাটখোলার এক পাশে কয়েকটা টিনের ঘরে বেশ্যাদের পাড়া। মিলিটারিদের আর কনট্রাক্টরদের দৌলতে যুদ্ধের বাজারে সে পাড়ায় এখন খুব রমরমা চলছে। গভীর রাতে কলের গানের বাজনা ভেসে আসে নদীর বাতাসে।

কিন্তু তিনকড়ির এরকম জায়গায় যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই। সেদিন খুব চেষ্টা করে পরেশ ডাক্তারকে এড়ানো গিয়েছিলো। পরেশ ডাক্তারও বুঝতে পেরেছিলেন এ ব্যাপারে তিনকড়ির আগ্রহ নেই।

সে যা হোক, আজ তরলাকুমারীর প্রসঙ্গ আসায় তিনকড়ি ভাবলেন ডাক্তার কি বলতে চান দেখা যাক। তরলা সম্পর্কে তাঁর কিছু কৌতূহলও জাগ্রত হয়েছে।

পরেশ ডাক্তারের কাছে এ বিষয়ে যেটুকু জানা গেলো তার মধ্যে খুব চমক বা নতুনত্ব না থাকলেও তিনকড়ি মন দিয়ে শুনলেন।

বছর তিনেক আগে তরলার বিয়ে হয়েছে। নদীর ওপারের মহারাজগঞ্জের মেয়ে। গরিব কিন্তু পালটি ঘর।

কিন্তু ঐ বিয়ে হওয়া পর্যন্তই যা। স্বামীর সঙ্গে বসবাস তরলার ভাগ্যে ঘটেনি। তরলার স্বামী অভয় গুহ শিলং হাসপাতালে ডাক্তারের কাজ করে। অভয়, পরেশ দত্তের মত নয়, রীতিমত পাস করা ডাক্তার। কিন্তু সেখানে অভয়ের আলাদা সংসার আছে। একটি খ্রিস্টান খাসিয়া নার্সকে বিয়ে করে অভয় হাসপাতালের কোয়ার্টারে বাস করে। তার একটি ছেলে এবং মেয়েও আছে। শোনা যায়, শিলংয়ের বড় গির্জায় ধর্মান্তরিত হয়ে অভয় খ্রিস্টান হয়েছে এবং তারপর বিয়ে করেছে।

অভয়ের এই প্রবাসজীবনের সংসারের কথা গুহবাড়ির লোকেরা যে জানতো না, তা নয়। জেনেশুনেই তারা তরলার সঙ্গে অভয়ের বিয়ে ঠিক করেছিল। সেই উনিশ শো একচল্লিশ সালের যমুনা-ধলেশ্বরীর পৃথিবীতে হিন্দু পুরুষের একাধিক বিয়ে বেআইনি ছিল না। অসামাজিক কাজ বলেও গণ্য হতো না।

অভয়ের খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারটা গুহবাড়ির লোকেরা আমল দেননি। হিন্দুর আবার ধর্মান্তর কি? হিন্দু হয়ে জন্মালে, হিন্দু হয়েই জীবন কাটাতে হবে। সে তুমি যাই করো না কেন? এমনকি মৃত্যুর পরে তোমাকে যদি পোড়ানো না হয়, মুখাগ্নি না হয়, শ্রাদ্ধ না হয় তা হলেও তোমার হিন্দুত্ব যাবে না। মৃত্যুর পরেও না।

পাড়াগাঁয়ের প্রাচীন হিন্দুসমাজ এসব কথা বুঝতো না। কিন্তু অভয় গুহের জ্যাঠামশায় অনল গুহ এই ধরনের কথা বলতেন।

যৌবনে অনল গুহ ছিলেন ঢাকা থেকে ঐ মহারাজগঞ্জ পর্যন্ত যে বিরাট এলাকা তার এক নম্বর ফুটবল খেলোয়াড়। গ্রামের টিম থেকে জেলা টিম, সেখান থেকে কলকাতায়, দু বছর মোহনবাগান টিমে গোষ্ঠ পালের পাশে দাঁড়িয়ে খেলেছেন।

কলকাতাতেই এক দক্ষিণী খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে এসে তিনি আর্যসমাজীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন, সেখান থেকে হিন্দুমহাসভা।

অনল গুহই তরলার সঙ্গে অভয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। স্বজাতে, ভিন্ন গোত্রে শাস্ত্রসম্মত ভাবে।

তিনি যে ভাইপো অভয়ের খ্রিস্টান বিয়ের কথা জানতেন না তা নয়, কিন্তু সেখানেও শাস্ত্র তাঁর সহায় ছিলো।

স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। যে কোনো কুল, এমনকি দুষ্কুল মানে খারাপ বংশ থেকেও স্ত্রী সংগ্রহ করা যায়।

কিন্তু খারাপ স্ত্রী যে কত খারাপ হতে পারে, ব্যাচেলার তথা চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার অনল গুহের কোনো ধারণা ছিলো না।

যখন ভাইপো অভয়, তরলাকে বিয়ে করার পর ফুলশয্যার দুদিন বাদে শিলং চলে গেলো এবং তারপর এক বছরের মধ্যে আর এলো না, কোনো চিঠিও দিলো না, অনল গুহ তরলা বৌমাকে নিয়ে শিলং চলে গেলেন।

সেখানে অভয় ডাক্তারের পাহাড়ি স্ত্রী, তার মা, মাসী, দিদিমা, ইত্যাদিরা পার্বত্য, অরণ্যের শক্ত দেবদারুর ডাল হাতে অনলবাবু এবং তরলাকে তাড়া করে আসে।

না, কোনো পুরুষমানুষ নয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সেটা। অনলবাবু তরলাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে স্বীকার করেছিলেন কোনো পুরুষমানুষ

তাঁদের তাড়া করেনি। কিন্তু এমন আক্রমণের মুখে কলকাতার মাঠে কোনো গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলতে গিয়েও পড়তে হয়নি।

পরেশ ডাক্তার অবশ্য এত সরাসরি কাহিনীটা বলেননি। তাঁর বলার মধ্যে অনেক হেঁয়ালি, অনেক শ্লেষ।

পরেশবাবুকে ঠিক বুঝতে পারেন না তিনকড়ি। তরলা সমাচার শেষ করার পর বললেন, 'যাই, আজ একটু তাড়াতাড়ি আছে। আজ একটা জল চিকিৎসা আছে।'

জল চিকিৎসা জিনিসটা কিরকম, সেটাও তিনি সংক্ষিপ্ত করে বললেন। তেমন তেমন বাঁজা রোগিণী এলে তিনি নৌকোয় করে নদীর খোলা হাওয়ায় দৈব চিকিৎসা করান যাতে শীঘ্র সন্তান হয়। নির্জন কোনো ঘাটে নেমে রোগিণীকে স্নান করিয়ে তারপর নিকটবর্তী কোনো শস্যক্ষেতের মধ্যে রোগিণীকে নিয়ে মা ষষ্ঠীর কৃপা ভিক্ষা করেন ডাক্তার।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে পরেশ দত্ত তাৎপর্যময় মুচকি হেসে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার বেশ একটু হাতযশ আছে।'

হাতযশ থাকা-না-থাকার কথাটা ছাড়াও ব্যাপারটার মধ্যে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত আছে। তিনকড়ির অস্বস্তি লাগছিলো।

মহারাজগঞ্জ থেকে স্টিমার এসে ঘাটে ভেড়ায় তিনকড়ি পরিত্রাণ পেলেন। পরেশ ডাক্তার চলে গেলেন, এই জাহাজে তাঁর রোগীরা আসবে। এখন ভিড় হয়ে যাবে। এই সময় তিনকড়িরও একটু কাজের চাপ পড়ে।

আশেপাশের গ্রামের লোকেরা যারা স্টিমার থেকে নামে তারা ডাকঘরে এসে খোঁজ নেয় তাদের পল্লীব কোনো চিঠি আছে কি না। আগে পল্লী বা গ্রামের নাম বলতে হতো, এখন তিনকড়ির সড়গড় হয়ে গেছে মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন কোন্ গ্রামের লোক, সেখানকার চিঠি থাকলে তার হাতে দিয়ে দেন।

বেশ কিছু লোক এই সময় খাম-পোস্টকার্ড কেনে। কেউ হয়তো মানি অর্ডার করা যায় কি না খোঁজ নেয়।

এসব ছাড়াও এই স্টিমারে তিনকড়িবাবুর একটি বাঁধা খদ্দেব রয়েছে। সে ভিন জেলার লোক, বোধহয় ববিশালের ভোলা অঞ্চলের লোক।

সে এই জাহাজের সহকারী সারেং কাশেম। কাশেম আলিকে অবশ্য ঠিক লোক বলা চলে না, সে সদ্য যুবক। তার সরল মুখখানির দিকে তাকালে বোঝা যায় সেখানে গোঁফের রেখা খুব বেশি দিন ওঠেনি।

কাশেম আলি মানুষটি শৌখিন। স্টিমারে তাকে তেলকালির মধ্যে কাজ করতে হয়। কিন্তু স্টিমার থেকে তীরে নামার সময় ময়লা গেঞ্জি, ছেঁড়া লুঙ্গি ফেলে রেখে গোলাপি পাঞ্জাবি, চেক কাটা লুঙ্গি পরে নেয়।

মাত্র অল্প দিন আগে কাশেম আলির বিয়ে হয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সঙ্গতিসম্পন্ন। এই যুদ্ধের বাজারেও তাকে বিয়েতে একটা হাতঘড়ি দিয়েছে।

এখন সেটাই হয়েছে সমস্যা। কাশেম আলি তার ঘড়ি ঠিক চলছে কি না প্রতিদিন নেমে তিনকড়ির ঘড়ির সঙ্গে মেলায়। আগে ঠিকমত না মিললে একটু গোলমাল হতো, কার ঘড়িটা ঠিক সেই প্রশ্ন নিয়ে। এখন তিনকড়ি, কাশেমের ঘড়িটা আগে দেখে নিয়ে তারপর নিজের ঘড়িটা দেখে কাশেমের ঘড়ির সময়টাই বলেন। মাস্টার- মশায়ের ঘড়ির সঙ্গে মিলে গেলে কাশেম খুব খুশি।

আজ কাশেম একটা নতুন খবর দিল। ঢাকা থেকে জাহাজে এক মহিলা উঠেছিলো, মহারাজগঞ্জে নেমেছে, সেই মেয়েছেলের হাতেও সে ঘড়ি দেখেছে। তবে আকারে ছোট। তিনকড়ি একটু অবাক হলেন, এই ভেবে যে কাশেম আগে লেডিস ঘড়ি দেখেনি। বোধহয় নিজে হাতঘড়ি পাওয়ার আগে তেমন খেয়াল করেনি।

জাহাজে তারপর দুবার ভেঁপু বেজেছে। পরপর দুবার, মানে বুড়ো সারেং কাশেমকে ডাকছেন, আর দেরি করা চলবে না, এবার স্টিমার ছাড়তে হবে।

কাশেম চলে গেলো। তিনকড়ি ডাকঘরের মেজের দিকে তাকালেন, সনাতন হরকরার ডাকের থলেটা পড়ে আছে। বেলা বারোটার মধ্যেই তিনকড়ি ওটার মধ্যে চিঠিপত্র ভরে গালা দিয়ে সিল করে রেখেছেন।

অল্প কিছুক্ষণ আগেও সনাতনকে দেখেছেন তিনকড়ি। মুদি দোকানের ঝাঁপের নিচে দাঁড়িয়েছিল। স্টিমার ছাড়তে যাচ্ছে। গেলো কোথায় দায়িত্বহীন লোকটা।

সনাতনকে খুঁজতে দবজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন তিনকড়ি। হঠাৎ একজন শক্তসমর্থ গ্রাম্য মানুষ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, ' সনাতন কোথায়?'

তিনকড়ি বললেন, 'আমিও তো তাকে খুঁজছি। তার ডাকের থলে পড়ে রযেছে, স্টিমার ছাডতে যাচ্ছে, এখনো তো নিয়ে গেলো না।'

এরপর তিনি অচেনা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সনাতনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন?'

লোকটি বললো, 'আমি সনাতন হরকরার শালা। আমার নাম গণেশ দাস। জামাইবাবু আজ তিনদিন বাডি যায়নি, মাঝেমধ্যেই এরকম হচ্ছে। তাই দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করতে এসেছে।'

তিনকড়ি দেখলেন গণেশেব পিছনেই এক প্রায় মধ্যবয়সিনী বৌ দাঁডিয়ে। কেমন আলুথালু জবুথবু ভাব। চোখের চাউনিও কেমন অস্বাভাবিক। সনাতনের বৌ পাগল নাকি?

তিনকডি কিছু বলার আগেই গণেশ বললো, 'এই আমার দিদি রেশমবালা। জামাইবাবুব অত্যাচাবে কেমন খ্যাপা-খ্যাপা হয়ে গেছে।'

ওদের দুজনকে ডাকঘরে বসিয়ে তিনকড়ি সনাতনকে খুঁজতে বেরোলেন। একজনকে শ্মশানঘাটে গাঁজার আড্ডাতেও পাঠালেন।

কিন্তু সনাতনকে কোথাও খুঁজে পাওযা গেলো না। সে নিশ্চয় এদের দেখে গা ঢাকা দিয়েছে।

এখন আর কোনো স্টিমাব নেই। আব এরাও তো সনাতনকে ধরে না নিয়ে যাবে না। ডাকঘরেই গণেশ ও রেশমের রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করলেন তিনকড়ি। রাতেব খাওয়ার জন্যে মুদির দোকান থেকে আধসের মুড়ি আর দুছটাক বাতাসা কিনে দিলেন।

গণেশ আত্মসম্মানী লোক। সে নিজেই দাম দিতে চাইছিল। কিন্তু তিনকডি তাকে এই বলে নিবৃত্ত কবলেন যে, গণেশকে ভাবতে হবে না, তিনি এই খরচা সনাতনের মাইনে থেকে কেটে নেবেন। কথাটা শুনে গণেশ বেশ খুশি হলো বলে মনে হলো।

ধীরে ধীরে সূর্য ডুবেছে। নদীর তীর অন্ধকার হয়েছে। মুদির দোকান, মিষ্টির দোকান ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে।

আকাশের তারাগুলো অবশ্য এখনো ভালো করে ফোটেনি। দুয়েকটা পাখির ঝাঁক এখনো বাসায় ফিরছে। আরেকটু পরে জোনাকি জ্বলে উঠবে, শেয়াল ডাকবে।

প্রচণ্ড গুমোট। আজ হয়তো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হবে।

পরেশবাবুর কথা খেয়াল ছিলো না তিনকড়ির। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, পরেশবাবু যেমন বলেছিলেন, জলচিকিৎসা করতে নৌকোয় রোগিণী নিয়ে নদীতে গেছেন।

কিন্তু তা নয়।

অন্য দিনের মত আজও পরেশ দত্ত তাঁর লণ্ঠন নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'কি হলো, যাবেন না?'

তিনকড়ি বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় নদীতে জল চিকিৎসা করতে গেছেন।'

পরেশ দত্ত বললেন, 'ব্যাড লাক। কি করবো বলুন? সব ঠিক ঠাক ছিল, এমনকি নৌকো পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগিণীটি এলো না। সাধে বাঁজা মেয়েছেলের ছেলেপিলে হয় না'।

পরেশ ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগে দমকা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর ঘাটে, সেই সঙ্গে সেই দরবেশের মহীরুহের ভেতর থেকে ঝুম-ঝুম শব্দ, শব্দটা আজ খুবই জোরে যেন হাজারটা ঢাক বাজছে।

ঝড়ো বাতাসের আন্দোলনে নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চিরে বিদ্যুতের ঝলকে নদীর দুই তীর আর নদী উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূরে হাটখোলার নটিবাড়ির কাছে একটা নৌকো মোচার খোলার মত টালমাটাল দুলছে। এরই মধ্যে ক্রমাগত বাজ পড়ছে।

একটু পরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। সেই সঙ্গে উদ্দাম হাওয়া, বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রগর্জন কমে এলো।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। ডাকঘরের ছোট তক্তাপোষে তিনকড়ি আর পরেশ ডাক্তার বসেছেন।

গণেশ আর তার দিদি সনাতনের বৌ মেঝেতে টিনেব বেড়া ঘেঁষে পাশাপাশি বসে।

লণ্ঠনের আলোয় তাদের দেখে পরেশ ডাক্তার সপ্রশ্ন হওয়ায় তিনকড়ি তাঁকে এদের ঘটনাটা বললেন।

লণ্ঠনটা তুলে ভাল করে রেশমবালাকে দেখে পবেশ ডাক্তার বললেন, 'কি নাম রেশম? সনাতন হরকরার বৌ? এর কথা আমি আগে শুনেছি। এর তো হিস্টিরিযার রোগ আছে।'

তিনকড়ি প্রশ্ন করলেন, 'হিস্টিরিয়া?'

পরেশ ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ। কামব্যাধি। এর জলচিকিৎসার খুব প্রয়োজন।'

তিনকড়ি চুপ করে রইলেন।

বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে।

(সাত) চিরদিনের শূন্যে

এই ঘটনা নিয়ে গল্প হয় না,
কবিতাও না।
কিন্তু কিছু পালক ভেসে বেড়ায়
চিরদিনের শূন্যে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মাথায় ঝড়-বৃষ্টি থামল। শুধু থামল নয়, আকাশ থেকে মেঘ কেটে গিয়ে ঝকঝকে নীল শূন্যে আধফালি চাঁদ উঠলো।

তিনকড়ি গণেশ ও তার দিদিকে ডাকঘরে রেখে পরেশ ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ি ফিরলেন।

দত্তপাড়ায় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে একটা-দুটো কদমগাছ। শেষ গ্রীষ্মের প্রবল বৃষ্টিতে কোনো কোনো গাছে কদম ফুটেছে। বৃষ্টি ভেজা বাতাসে কদমফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে। গুহবাড়ির সীমানায় রাস্তার দিকে একটা কদমগাছ। পরেশ ডাক্তার একটু আগে নিজের বাড়িতে ঢুকে গেলেন। এখন তিনকড়ি একা। কেউ দেখছে না বুঝতে পেরে তিনি রাস্তার পাশ থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে দুয়েকটা কদম পাড়া যায় কি না চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু ততক্ষণে তরলা আলো হাতে বাইরে উঠোনের দরজার মুখে চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি তিনকড়ি নিজের ঘরে চলে এলেন।

পরদিন খুব ভোরবেলায় গণেশের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙলো। বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলতে তিনকড়ি দেখলেন একগুচ্ছ কদমফুল, ডালপাতা শুদ্ধ, দরজার পাশে রাখা রয়েছে। নিশ্চয় তরলার কাণ্ড।

এদিকে গণেশ যা বললো, সেটা খুবই গোলামেলে। শেষরাতের দিকে

রেশমবালা ডাকঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে যায়। তাবপর আর ফেরেনি।

তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়ে গণেশকে নিয়ে তিনকড়ি পরেশবাবুর কাছে গেলেন। তিনি গ্রামের মুরুব্বিদের একজন, দেখা যাক কি পরামর্শ দেন।

কিন্তু বাড়িতে গিয়ে পরেশ ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। জানা গেল, শেষ রাতে রোগী দেখতে বেরিয়েছেন।

এখন কি করা যায়। গণেশ তার গ্রাম্য বুদ্ধিতে এটা বোঝে ঘরের বৌকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা চাউর করার মত কথা নয়। তিনকড়িও সে ব্যাপারে একমত।

তিনি গণেশকে নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগোলেন। বাস স্ট্যান্ড ফাকা, মাত্র দুজন ভিনগাঁয়ের যাত্রী ফার্স্ট বাসে যাবে বলে অপেক্ষা করছে। স্টিমার ঘাটে কেউ নেই। মিষ্টির দোকানে ঝাঁপ খুলেছে। একজন কর্মচারী কাঠের উনুনে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছে। আগের দিন সন্ধ্যার অতর্কিত বৃষ্টিতে সব কাঠ ভিজে গেছে, আগুন ধরতে চাইছে না। ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ডাকঘরের দরজা গণেশ ভেজিয়ে গিয়েছিলো। দূর থেকে দেখা গেলো এখন দরজাটা হাট করে খোলা।

তিনকড়ি ডাকঘরের মধ্য গিযে দেখতে পেলেন সনাতনের সেই ডাকের ঝোলাটা নেই। সবাই জানে যে এর মধ্যে ডাকের কাগজপত্র, চিঠি-চাপাটি ছাড়া কিছু থাকে না। এ ঝোলা আর কে নেবে?

গণেশ বললো, 'ঝোলা ঐ হরকরাই নিয়ে গেছে। নিশ্চয় দিদিকে দেখতে পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা হবে ভয়ে কোনো নৌকোয় উঠে দিদিকে নিয়ে চলে গেছে। আমি সকালের জাহাজে ফিরে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার।'

এখন আব গুহবাড়িতে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। ডাকঘরে একটা গামছা আছে, সেটা নিয়ে তিনকড়ি নদীতে নেমে গেলেন স্নান করার জন্যে।

এখন নদী খুব শান্ত। অনেকদিন পরে একটু সাঁতার কাটলেন তিনি।

নদীর ঘাট থেকে উঠে আসছেন এমন সময় দেখলেন একটা নৌকো থেকে পরেশ ডাক্তার নামছেন। পরেশ ডাক্তার যেন তাঁকে দেখতে পেয়েও দেখতে পেলেন না, একটু এড়িয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন সনাতন হরকরা এলো। রীতিমত আচ্ছন্ন ভাব। বোধহয় ক্রমাগত গাঁজা খেয়ে যাচ্ছে। তাকে রেশমবালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যায় না। সনাতন তাঁকে নিজে থেকে কিছু বললে তাহলে কথা ছিলো।

রেশমবালার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তিনকড়ি।

এদিকে তরলাকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। সেই কদমফুল দিয়ে শুরু হয়েছিলো। তার পরে পানের খিলি, সরের নাড়ু, গন্ধরাজের তোড়া, বকুলের মালা এমনকি কাঁচামিঠে আম গোপনে অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে তরলা দিনের পর দিন উপহার দিয়ে যাচ্ছে।

গৃহস্থবাড়িতে পরস্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া, যথেষ্ট গোলমাল হতে পারে। বেশ কয়েক বছর উকিলের সেরেস্তায় কাজ করে তিনকড়ি সেটা বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু তরলাকে ঠেকাতে পারেন এমন কৌশল তিনকড়ির জানা নেই। কারো কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন এমনও নেই।

এদিকে এবার ঘোর বর্ষা। অবিরাম বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, নদীতে জল বাড়ছে। আরেকটু বাড়লে বাসরাস্তা ডুবে যাবে। বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই এখন বাস কম। বর্ষায় কয়েকটা বাস বসে গেছে, দুটো ভাল বাস মিলিটারি রিকুইজশন করে নিয়ে গেছে। সে কবে ফেরত পাওয়া যাবে বলা অসম্ভব।

একদিন প্রবল বর্ষণের মধ্যে নদীর ঘাটে এক পাগলিনীকে দেখা গেলো। ডাকঘরে থেকে বেশ কিছুটা দূরে স্টিমার ঘাটের কাছে।

বৃষ্টি থামতে দেখা গেলো সেই পাগলিনীকে ঘিরে বেশ ভিড় জমেছে। কি ব্যাপার দেখতে যাচ্ছিলেন তিনকড়ি, পরেশ ডাক্তার তাঁর ডাক্তারখানা থেকে রোগী দেখতে দেখতে নিষেধ করলেন, 'ওদিকে যাবেন না। নোংরা ব্যাপার।'

পরেশবাবুর মুখ থেকে নোংরা কথাটা শুনে কিন্তু তিনকড়ির অবাক লাগলো। তবু ডাকঘরে ফিরে গিয়ে তিনকড়ি নিজের জায়গায় বসলেন।

কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে আছেন এমন সময় একটি নারীকণ্ঠে তিনি সজাগ হলেন। এ অঞ্চলের কোনো মহিলাই কখনো ডাকঘরে আসে না।

গলা শুনে জানলা দিয়ে তাকিয়ে তিনকড়ি দেখেন, সেই পাগলিনী দাঁড়িয়ে। এলোমেলোভাবে কোনোরকম করে একটা খাটো শাড়ি শরীরে জড়ানো। তিনকড়ি তার দিকে তাকাতে পাগলিনী করুণ কণ্ঠে বললো, 'মাস্টারমশায়, আমারে একটা চিঠি দিবেন।'

পাগলিনীকে দেখে তিনকড়ির কেমন চেনা-চেনা মনে হলো। তিনকড়ির অনুমান ভুল নয়। যদিও এর আগে একবার মাত্র দেখেছেন, তবু এ চোখের সেই খ্যাপা চাউনি দেখে ধরতে পারলেন। এ সেই সনাতন হরকরার বৌ, রেশমবালা।

রেশমবালা চিঠি না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। সে একটু এগিয়ে যেতেই তাকে ঘিরে একটা নাটক শুরু হলো। অশ্লীল, বীভৎস এক নাটক।

বর্ষার ঘেরাটোপে বন্দী এই অজ পাড়াগাঁয়ে স্বাভাবিক আমোদপ্রমোদের নিতান্ত অভাব। লোকেরা অন্যভাবে মজা করে। পাগল পেলে খুব সুবিধে হয় মজা করায়, বিশেষ করে যুবতী পাগলিনী হলে। এখন রেশমবালাকে ঘিরে একদল লোক দাঁড়িয়ে পাশবিক মজা করছে। রেশমবালার হাতে একেক জন একেকটা ফুটো পয়সা দিচ্ছে, আর বলছে, 'দেখা।' আর রেশম সেই পয়সা, যুদ্ধের সময় তামা বাঁচানোর জন্যে চাকতির মত, মধ্যে ফুটো, পাতলা এক পয়সা, সেটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে খাটো শাড়িটা কোমর পর্যন্ত তুলে যা দেখাবার কিংবা যা দেখানো যায় না তাই দেখাচ্ছে।

এর মধ্যে অন্য একটা ঘটনা ঘটেছে। হয়তো আরও মজা করবার জন্যেই গাঁজার আড্ডায় সনাতনকে কে যেন খবর পাঠিয়েছে।

সনাতন হরকরার তখন চোখ লাল, বুদ্ধি অস্থির। সে আসার পথে একটা জিগা গাছের ডাল ভেঙে এনেছিল। কৌতূহলী দর্শকদের পিঠে সে ডালের দুচার ঘা পড়লো বটে কিন্তু বেধড়ক মার খেলো রেশমবালা।

তিনকড়ি এগিয়ে গিয়ে রেশমবালাকে রক্ষা করতে যাচ্ছিলেন, পরেশ ডাক্তার তাকে আটকালেন, বললেন, 'বাধা দেবেন না। প্রবল প্রহার পাগলের মহৌষধ।' যা হোক, প্রচণ্ড জলঝড় আসায় রেশমবালা রক্ষা পেলো।

সেই দিন রাতে ডাকঘরে সনাতন ও রেশমের শোয়ার ব্যবস্থা করে তিনকড়ির একটু দেরি হলো। কিন্তু হেঁটে বাসায় ফেরা যাবে না। গ্রামের রাস্তা এখন বর্ষায় খাল হয়েছে। হয় নৌকোয় যেতে হবে না হয় সাঁতরে যেতে হবে। গাছতলায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন তিনকড়ি। শুধু দত্তপাড়ায় কেন, পুরো নিঝুমপুরে যাওয়ার কোনো নৌকো এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় পাওয়া গেল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছিল, তিনকড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এখানেই গাছতলায় শুয়ে পড়বেন। এমন সময় ছায়ামূর্তির মত সনাতন উদয় হলো।

সনাতনকে দেখে তিনকড়ির প্রথম স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা হলো, 'রেশম?'

সনাতন প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'সে আপনারা ভাববেন না। রেশমকে আমি দেখবো। এখন সে ঘুমাচ্ছে।'

তিনকড়ি বলতে পারতেন, 'এতদিন তুমি রেশমকে যা দেখেছো। সে তো বুঝতে পারছি।' কিন্তু ততক্ষণে একটা ডিঙি নৌকো গাবতলার ঘাটে নিঝুমপুরের মুখে চলে এসেছে। দুটো ছেলে বৈঠা বাইছে। তাদের বোধ হয় ইঙ্গিত করেছিল সনাতন, সেই ইঙ্গিতে খালের মুখে চলে এসেছে।

স্বাভাবিক কারণেই তিনকড়ি সনাতনের কাছে জানতে চাইলেন, 'এরা কারা?'

সনাতন বললো, 'আমরা সবাই গাঁজাখোর।'

সত্যিই গাঁজাখোর ছিল তারা। নদী ছেড়ে খালে ঢুকে তারা বৈঠা ফেলে লগি ধরলো। তারপর ঘুরপাক খেতে লাগলো নিঝুমপুরের জলমগ্ন গ্রামপথে।

দুয়েকবার গুহবাড়ির খুব কাছে এসে গিয়েছিলেন তিনকড়ি। ইচ্ছে

করলে এক লাফ দিয়ে ডিঙি থেকে নেমে পড়তে পারতেন। কিন্তু তাঁরও কেমন একটা মোহ জন্মে গিয়েছিল জলো গন্ধে, জলো বাতাসে। ছাড়া-ছাড়া মেঘে ঢাকা আধো অন্ধকারে জামতলা দিয়ে, বাঁশবনের পাশ কাটিয়ে, বুড়ো শিবঠাকুরের চাতাল এড়িয়ে ডিঙি চলছে তো চলছেই।

শেষ পর্যন্ত যখন গুহবাড়ির উঠোনে নামলেন তিনকড়ি, হাতের ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে বারোটা। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন ঘরের দাওয়ায় তরলার আতু-আতু কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

কুকুরগুলোর পাশ কাটিয়ে ঘড়ে ঢুকে থমকিয়ে গেলেন তাঁর বিছানায় তরলা শুয়ে রয়েছে। বালিশে এলোমেলো চুল, অবিন্যস্ত শাড়ি-জামা। জানলা দিয়ে আসা তারার আলোয় তরলার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন তিনকড়ি।

দিন যায়। দিনের পরে দিন যায়।

কদম ফোটা শেষ হলো। আকাশের মেঘের রঙও হালকা হয়ে এসেছে। ভোর বেলা শেফালি ঝরছে শিশির ভেজা ঘাসে। খাল-বিলের দিক থেকে ঢাকীদের ঢাক বাজানোর শব্দ আসছে। বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ। শীত এসে গেলো।

দিন যায় দিনের পরে দিন যায়।

মন্বন্তরের আঁচ কমে এসেছে। দোকান বাজারে আবার কিছু কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে। দাম কিছুটা নেমেছে। ইংরেজরা যুদ্ধটা হারতে হারতে জিতে গেছে। জাপানিদের খুব খারাপ অবস্থা।

দিল্লিতে কলকাতায় লন্ডনে কোথায় কি সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ দেশে নাকি আর থাকা যাবে না। ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এসব নিয়ে তিনকড়ি আর মাথা ঘামান না। ভিটেমাটি তিনি তো কবেই সখিপুরে ছেড়ে এসেছেন।

শোনা যাচ্ছে, স্টিমার এখন যমুনা দিয়ে সরাসরি যাতায়াত করতে

পারছে। যমুনার জল বেড়েছে নতুন ওঠা চরাগুলোও গত বছরের বন্যায় বিলীন হয়ে গেছে। কিছুদিন পরে হয়তো নিঝুমপুর ঘাটে আব স্টিমাব ভিড়বে না। তখন বাসও কমে যাবে। টাইম নিয়ে কড়াকড়ি থাকবে না। তবে ডাকঘরটা থাকবে।

তিনকড়ি রুটিনমত ডাকঘরে যান। আজকাল কখনো রবিবারেও ডাকঘরে চলে যান। দিনের বেলায় গুহবাড়িতে থাকতে ভয় পান। তরলা কখন কি বেচাল কিছু করে ফেলবে।

রাতের দিকে তরলার আসা প্রায় নিয়মিত হয়ে গেছে। দিদিশাশুড়িব দায়িত্ব তার ওপর। দিদিশাশুড়ির ঘরে সে শোয়। বুড়ি ঘুমিয়ে গেলে তরলা নিঃশব্দে উঠে আসে। তার কুকুরগুলো তার পায়ে পায়ে ঘোরা ফেবা কবে।

শেষ রাতে কাক ডাকবার আগে তরলা দিদিশাশুড়ির ঘরে ফিরে যায়।

কেউ কি টের পায়? বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে উদাসীন। পরেশ ডাক্তার লোকটা চতুব, তিনি থাকলে কিছু একটা অনুমান কবে নিতেন। কিন্তু অবৈধ গর্ভপাত করতে গিয়ে ভিনগাঁয়ের একটি বিধবা মহিলাকে তিনি মেরে ফেলেন। তারপর থেকে তিনি পলাতক, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

কত চিঠি লেখে লোকে। ডাকঘরে চিঠি যায়, চিঠি আসে। তিনকড়ি মাস্টারের দিন কাটে।

সনাতন হরকবা আগের মতই আছে। সে ডাকের ঝোলা নিয়ে নদী পারাপার করে। তবে সে গাঁজা খাওয়া অনেক বাড়িযে দিয়েছে। এখন সব সময়েই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। কেমন নিস্তেজ হযে গেছে হরকরা।

রেশমবালা এখন স্টিমার ঘাটের অঙ্গ হয়ে গেছে। সে এখন পুরো পাগল। সনাতন তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। সাধারণ মানুষদের কৌতূহলও তার সম্পর্কে কমে গেছে। সন্ধ্যার পরে রেশমবালাকে দেখা যায় হাসতে হাসতে চেনা-অচেনা নৌকোয় উঠে চলে যাচ্ছে।

দিনেব বেলায় ঘাটে থাকলে, যদি সনাতন না থাকে রেশমবালা ডাকঘরের কাছে আসে। জানালা দিয়ে হাত বাডায়, 'মাস্টার মশায়, আমারে একটা চিঠি দিবেন?'

আজকাল রেশমবালার অনুরোধ রক্ষা করেন তিনকড়ি। অনেকগুলো বাজে কাগজ কাঁচি দিয়ে টুকরো করে কেটে রেখেছেন। রেশমবালা হাত বাড়ালেই তার হাতে একটা দিয়ে দেন, সে খুশি হয়ে চলে যায়।

একদিন অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে গুহবাড়ির দুটো চিঠি এলো। চিঠির ওপর শিলমোহরের ছাপ শিলং, আসাম।

একটি চিঠি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার গুহের নামে। আরেকটি শ্রীমতী তরলারানী দাসী, কল্যাণীয়াসু।

পরের দিন থেকে গুহবাড়িতে হইচই পড়ে গেলো। তরলার স্বামী অভয় ডাক্তার শিলংয়ের চাকরি আর সংসার ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসছে। এখানেই বসবাস করবে। এখানেই ডাক্তারি করবে। সামনের মাসের গোড়াতেই সে আসছে।

চিঠি আসার পর দুদিন রাতে তরলা এলো না। তিনকড়ি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেলো। আবার একটু মায়াও হলো। তরলার নৈশ অবস্থিতি তাঁর প্রায় অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন শেষ রাতে খুব চুপিসারে তরলা এলো। আলগোছে তিনকড়ির ঘুম ভাঙিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'সবাই আমার দিকে কড়া নজর রেখেছে। আমি আসতে পারছি না।'

তিনকড়ি বললেন, 'আর আসার দরকার কি? তোমার বর তো এসে যাচ্ছে।'

তরলা ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'বর না ছাই! তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

তিনকড়ি বললেন, 'কোথায়?'

তরলা বললো, 'সে তুমি জানো'।

কোথায় থেকে কি হয়ে গেলো।

পরের দিন ডাকঘরে গিয়ে তিনকড়ি একটা ডাকের থলেতে পোস্টাফিসের কাগজপত্র, খাম, পোস্টকার্ড, ডাক টিকেট, খুচরো টাকা পয়সা, শিলমোহর এসব ভরলেন। তারপর সেই সঙ্গে চাকরি ছেড়ে

দেয়ার দরখাস্ত দিলেন। সব ব্যাগে পুরে গালা দিয়ে সিল করে রাখলেন। সনাতন আসতে তাকে বললেন, 'আমি ডাকঘরের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি সব জিনিসপত্র এই ব্যাগে রয়েছে, কাল সদর ডাকঘরে বড় পোস্টমাস্টার সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ো।'

সনাতন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো। তিনকড়ি তাকে বললেন, 'কাল শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে থাকতে আমাকে একটা নৌকো ঠিক করে দেবে। পারবে তো?'

সনাতন বললো, 'পারবো।'

দিনের আলো ফুটবার আগে এক বস্ত্রে তরলাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন তিনকড়ি। ঘাটে সনাতন নৌকো নিয়ে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল।

ঘাটের ধারে বালির ওপরে রেশমবালা শুয়েছিলো। ফিকে অন্ধকারে মাস্টারমশায়কে দেখে সে চিনতে পেরেছে, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সে তিনকড়ির কাছে এগিয়ে এসে হাত পাতলো, 'আমারে একটা চিঠি দিবেন মাস্টার মশায়।'

আজ রেশমের অনুরোধ তিনকড়ি রক্ষা করতে পারলেন না।

নৌকো ছেড়ে দিল। তরলার কুকুরগুলো তার পিছে পিছে ঘাট পর্যন্ত এসেছিল। যতক্ষণ দেখা যায় তারা নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

চারদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। চিলের ডাক গাঙশালিকের চেঁচামেচি ক্রমশ বাড়ছে। নদীতে দুয়েকটা গয়নার নৌকো, জেলে নৌকো দেখা যাচ্ছে।

নিঝুমপুরের বাঁকটা পেরিয়ে এলো তরলা-তিনকড়ির নৌকো।

ঝড়ের রাতে উড়িয়ে নিয়ে আসা আরব্য উপন্যাসের সেই অচেনা মহীরুহের ভেতর থেকে ঝুম-ঝুম আওয়াজটা আসছে।

এতক্ষণ তরলা চুপ করে ছিলো—শব্দটা শুনে তরলা গাছটার দিকে তাকাতে তিনকড়ি বললেন, 'ও কিছু নয়, গাছের মধ্যে বাতাস ঢুকে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, ডালপালায় আটকিয়ে গেছে।

তরলা বললো, 'জানি।'

নৌকো এবার খরস্রোত বেয়ে তরতর করে এগোচ্ছে। একবার পিছন ফিরে বিলীয়মান নিঝুমপুরের বাঁকের দিকে তাকালেন তিনকড়ি।

দূরে ধুলো উড়িয়ে একটা বাস আসছে রাস্তা দিয়ে। এই ভোরবেলায় জোরে জোরে হর্নের শব্দ এতদূরে নদীর মধ্যে ভেসে আসছে।

বাস রাস্তাটার দিকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলেন।

ঐ পথ দিয়ে নিঝুমপুর যাওয়া যায়। আবার ঐ পথ দিয়ে নিঝুমপুর থেকে ফিরে আসাও যায়।

নৌকো মাঝনদীতে এসে গেছে। এখন আর পথটা দেখা যাচ্ছে না।

ঐ পথ দিয়ে তিনকড়ির আর কখনো যাওয়ার কিংবা ফেরার প্রশ্ন নেই।